শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলা

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ
যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায়
কেশবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম
শ্রীমধুসূদন
গিরিধারী গোপীনাথ
মদন মোহন ॥

হরে কৃষ্ণ হরে রাম

শ্রীরাধে গোবিন্দ

প্রভু নিত্যানন্দ

(মা-মণি কর্ত্তৃক প্রাপ্ত)

ওঁ হরি

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুদত্ত

নামব্রহ্ম

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

* * * *

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমের ভজন কুটির গাত্রে স্ব-হস্ত লিখিত উপদেশ

(ক) কুটিরের উত্তর দেওয়ালের বর্হিগাত্রে

ওঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যায় নমঃ

(এইখানে একটি পতাকা অঙ্কিত)

(খ) কুটিরের অভ্যন্তরে উত্তর দেওয়ালের গাত্রে
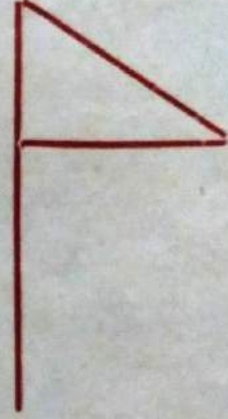
এইছা দিন নাহি রহেগা।

১। আত্ম প্রশংসা করিও না।

২। পরনিন্দা করিও না।

৩। অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।

৪। সর্ব্বজীবে দয়া কর।

৫। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

৬। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।

৭। নাহং কারাৎ পরোরিপুঃ

শ্রীশ্রীগোপালজী

শ্রীশ্রীগোপালের গান

১২ই ফাল্‌গুন ১৩৭১

গোপাল বলল - " একটা গান শুনবে ? লিখে নাও ।" বলে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করে নেচে নেচে গানটি গাইল –

গান

প্রেমের প্রেমিক, প্রেমের বণিক, প্রেমই আমার ব্যবসায় ।
প্রেম পসরা মাথায় করে বেড়াইগো পাড়ায় পাড়ায় ।।
প্রেম পণে প্রেম কিনি বেচি,
প্রেমেই মরি প্রেমেই বাঁচি,
আমার এই প্রেমটি বড়ই সাঁচি,
তাই এ প্রেম সবাই পেতে চায়।
সবাই চায় গো সস্তায় পেতে,
উচিৎ মূল্য চায় না দিতে,
কেবল রাধার কাছে প্রেম বেচিলে,
আসল উঠে লাভ দাঁড়ায় ।।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

স্তোত্র

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি রহস্যং শ্রুতিনোদিতম্।
যন্ন কস্যাপি চাখ্যাতং সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥
শ্রুত্বাপরস্মৈ নো বাচ্যং যতোহতীবরহস্যকম্।
মূলপ্রকৃতিরূপিণ্যাঃ সংবিদো জগদুদ্ভবে ।
প্রাদুর্ভূতং শক্তিযুগ্মং প্রাণবুদ্ধ্যধিদৈবতম্।
জীবনাশ্চৈব সর্ব্বেষাং নিয়ন্তৃ প্রেরকং সদা ॥
তদধীনং জগৎসর্ব্বং বিরাড়াদিচরাচরম্!
যাবত্তয়োঃ প্রসাদো ন তাবন্মোক্ষো হি দুর্লভঃ ॥
ততস্তয়োঃ প্রসাদার্থং নিত্যং সেবেত তদ্দ্বয়ম্।
তত্রাদৌ রাধিকামন্ত্রং শৃণু নারদ ভক্তিতঃ ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণ্বাদিভির্নিত্যং সেবিতো যঃ পরাৎপরঃ।
শ্রীরাধেতি * চতুর্থ্যন্তং বহ্নের্জ্জায়া ততঃ পরম্ ॥
ষড়ক্ষরো মহামন্ত্রো ধর্ম্মাদ্যর্থ প্রকাশকঃ।
মায়াবীজাদিকশ্চায়ং বাঞ্ছাচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ ॥

---

* একদিন শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন মা, পূর্ব্বে একদিন[১] যে শ্রীরাধারাণীর স্তোত্র শুনেছিলে ও লেখা দেখেছিলে, দেবর্ষি নারদকে নারায়ণ ঋষি ব'লছিলেন। স্তোত্রটী লিখে রাখ। শ্রীবৃন্দাবনলীলা লেখবার সময় প্রথম পাতায় শ্রীরাধারাণীর স্তোত্রটী লিখে তারপর লীলা দর্শন লিখবে। দেবী ভাগবতে স্তোত্রটী আছে। আমি—আমার দেবী ভাগবত তো নেই, কোথায় পাব? তখন বললেন—রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব যে বই আছে তাতেও আছে। আমার বহুদিনের পুরাতন বই এর বাক্স থেকে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব বইখানি খুঁজে বের ক'রে দেখে স্তোত্রটী লিখলাম।

১ শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু উপদেশামৃত—৩য় খণ্ড : ২রা পৌষ ১৩৫৮ (৮)

বক্তু কোটি সহস্রৈস্তু জিহ্বা-কোটিশতৈরপি

এতন্মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে।

জগ্রাহ প্রথমে মন্ত্রং শ্রীকৃষ্ণো ভক্তি তৎপরঃ।

উপদেশান্মূল দেব্যা গোলোকে রাসমণ্ডলে ॥

বিষ্ণুস্তেনোপদিষ্টস্তু তেন ব্রহ্মা বিরাট্ তথা।

তেন ধর্ম্মস্তেন চাহহমিত্যেষা হি পরম্পরা ॥

অহং জপামি তং মন্ত্রং তেনাহহমৃষিরীরিতঃ।

ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা নিত্যং ধ্যায়ন্তি তাং মুদা ॥

কৃষ্ণার্চ্চায়াং নাধিকারো যতো রাধার্চ্চনং বিনা।

বৈষ্ণবৈঃ সকলৈস্তস্মাৎ কর্ত্তব্যং রাধিকার্চ্চনম্।

কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী সা তদধীনো বিভুর্যতঃ।

রাসেশ্বরী তস্য নিত্যং তয়া হীনো ন তিষ্ঠতি ॥

শ্রীমদ্দেবী ভগবত

৯।৫০।৫-১৭

[নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! সেই শ্রুতিসম্মত সারাৎসার পরাৎপর পরম রহস্য (রাধা ও দুর্গার উপাসনা প্রকার) অদ্যাপি কাহারও নিকট কথিত হয় নাই; এই সর্ব্ব প্রথম তোমার নিকটে বলিতেছি; তুমি এই অতীব গোপনীয় বিষয় শ্রবণ করিয়া, আর কাহাকেও বলিও না। মূল প্রকৃতিরূপিনী চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরী হইতে জগতের উৎপত্তি কালে, প্রাণ ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুই শক্তি আবির্ভূ'তা হন। (তন্মধ্যে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাধাশক্তি এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গাশক্তি; ইহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি; বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে।) এই নিখিল বিরাড়াদি চরাচর জগৎ সেই শক্তি যুগলের অধীন। তাঁহাদের অনুগ্রহ ব্যতীত মুক্তিলাভ অতীব দুর্ঘট। এই কারণে তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত প্রতিদিন সেই শক্তি যুগলের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। হে নারদ! সে শক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে রাধিকাশক্তির মন্ত্র—যাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ নিয়মিত জপ করিতেন, সেই পরাৎপর রাধা মন্ত্র বলিতেছি, ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ কর। প্রথমে মায়াবীজ, তৎপরে চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত "শ্রীরাধা", অন্তে বহ্নিজায়া অর্থাৎ স্বাহা যোগে ঐ মন্ত্র অর্থাৎ "শ্রীরাধায়ৈ স্বাহা" এই ষড়ক্ষর মহামন্ত্রে ধর্ম্মাদি লাভ হইয়া থাকে। আদিতে মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীং যোগে ঐ মন্ত্র বাঞ্ছাচিন্তামণি হইয়া থাকে ॥ ৫—১১ ॥

উক্ত মন্ত্রের মহিমা সহস্র কোটি মুখে, শত কোটি জিহ্বাতেও বর্ণনা করিতে পারা যায় না। প্রথমে গোলোক

ধামে রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ মূল প্রকৃতি দেবীর উপদেশে এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বিষ্ণু, বিষ্ণুর উপদেশে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার উপদেশে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের উপদেশে আমি উক্ত মন্ত্র গ্রহণ করি। আমি উক্ত মন্ত্র জপ করি বলিয়া ঋষি নামে অভিহিত হইয়াছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই পরমানন্দে নিয়ত সেই রাধাশক্তির ধ্যান করিয়া থাকেন। রাধিকার পূজা ব্যতীত কৃষ্ণের পূজায় অধিকার হয় না; সুতরাং সকল বৈষ্ণবেরই রাধার পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাধা, কৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কৃষ্ণ রাধার অধীন। রাধা সর্ব্বদা কৃষ্ণের রাসেশ্বরী হইয়া রহিয়াছেন। কৃষ্ণও ক্ষণকালের জন্য রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না॥ ১২—১৭॥]

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলা

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

"প্রেমভক্তিপ্রদাতারং আনন্দানন্দবর্ধনম্ ।
স্বর্ণময়ীসুতং বন্দে যোগমায়া মনোহরম্ ।।
বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্দ্ধিনীম্ ।
সদানন্দময়ীং স্বাধ্বীং যোগমায়াং নমাম্যহম্ ।।"

১৮ই ভাদ্র ১৩৫৬

রাত্রি অনুমান তিনটা হবে, ঠিক বুঝতে পারছি না। আসনে বসে তন্দ্রার মধ্যে দেখছি অনেকগুলি ব্রজমায়ী দাঁড়িয়ে আছেন। সেই ব্রজমায়ীদের ভাল করে দেখবার পূর্বেই সে অবস্থা চলে গেল। সকাল থেকে খুব আনন্দ হচ্ছে। বেলা নয়টায় সময় নামের কৃপা হল, নামে ডুবে গেলাম। সেই অবস্থায় সব দর্শন হল। ব্রজবালকেরা এসে বলছে, "তোমার গোপালকে দাও, গোষ্ঠে নিয়ে যাব।"
আমি(মা-মণি) - আজ সকালে গোপাল একটু সরবৎ খেয়ে আছে, আর কিছু খায়নি কি করে তোমাদের সঙ্গে পাঠাবো ? তখন তারা বলল, "মা যশোদা আমাদের আঁচলে নবনী বেঁধে দিয়েছেন। আমরা তোমার গোপালকে খাওয়াব।" গোপালও আমার গলা ধরে "মা যাই" বলে আবদার করতে লাগল। তখন সেই ব্রজবালকেরা গোপালকে নিয়ে চলে গেল। সে অবস্থা চলে গেলে দেখি আসনে বসে আছি, নাম করছি।

১৯শে ভাদ্র

বেলা সাতটা কিংবা আটটা। আসনে বসে নাম করতে করতে দেখছি ১২-১৩টি নয় দশ বছরের মেয়ে, সব চুল খোলা, যমুনার জলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে পিছন

ফিরে থাকায় তাদের মুখ দেখতে পেলাম না। তখনই ঘোর কেটে গেল, আর কিছু দেখা গেল না। ঠাকুর যে কি আনন্দেই রেখেছেন, তাঁর কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা।

২০শে ভাদ্র

সকালবেলা আন্দাজ সাতটা। আসনে বসে নাম করতে করতে তন্দ্রার মধ্যে দেখছি যমুনাতে দশ-বারোটি ব্রজগোপী পিতলের গাগরীগুলি পাড়ের উপর রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ছায়ার মতো দর্শন হলো। তারপর দেখলাম শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী যোগমায়াদেবী বসে আছেন, আর শ্রীশ্রীগুরুদেব(ভক্তিভাজন শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়) দাঁড়িয়ে আছেন। একটি সাত-আট বছরের শ্যামবর্ণ ছেলে, কি সুন্দর দেখতে! হলদে রঙের কাপড় পরা, মাথায় চূড়া, হাতে একটা বাঁশি। আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,"এখানে একমুঠো প্রসাদ পেয়ে থাকতে পাবো ?" ছেলেটি খুব উৎসাহ করে বললে,"খুব পাবে,খুব পাবে।" (সেই প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে দেখে পর্যন্ত আবার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে)
[সেদিন দুপুরবেলা শ্রীগোবিন্দজী'র একজন পূজারী এসে জিজ্ঞাসা করলেন,'আপনি কি গোবিন্দজী'র প্রসাদ রাখবেন?' আমি রাখলাম, পাঁচখানি রুটি ও কিছু ডাল-তরকারি। যতদিন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলাম প্রত্যহই ঐ রুটি ও ডাল-তরকারি তিনি দিয়ে যেতেন। সেই প্রসাদই পেতাম, আমাকে আর রান্না করে খেতে হয় নি]

২১শে ভাদ্র

ভোর পাঁচটা। আসনে বসে কিছুক্ষণ পরে তন্দ্রার মধ্যে দেখলাম - একটা বেশ বড় ঠাকুর দালান। সেই ঘরে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বসে আছেন। সেখানে পূজার সমস্ত উপকরণ সাজানো রয়েছে। ব্রজমায়ী'রা গাগরী মাথায় নিয়ে নৃত্য করতে করতে যমুনায় যাচ্ছেন। আবার দেখলাম আমার ছোট গোপাল এসে বলছে,"মা যশোদার কাছে ননী খেয়ে এলাম।" তারপর দেখলাম হলুদ রঙের বাঘছাল পরে মহাদেব দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন,"ইনিই গোপীবেশে রাসে নৃত্য করেছিলেন।" তারপর দেখলাম একটি ঘরে শ্রীশ্রীগুরুদেব বসে আছেন, সেই সৌম্যমূর্তি। আমি দুটি গোলাপ ফুল নিয়ে তাঁর চরণে দিলাম। কি বললেন বুঝতে পারলাম না।

২২শে ভাদ্র

সকালে আসনে বসে আছি। দেখলাম গোপাল কোলে করে মা যশোদা বসে আছেন। গোপালকে আদর করছেন। সন্ধ্যায় আসনে বসে নাম করতে করতে দেখি শ্রীমতী রাধারাণী অনেকগুলি সখীর সঙ্গে অভিসারে যাচ্ছেন। অপূর্ব উজ্জ্বল মূর্তি। ঘাগড়া পড়া, ওড়না মাথায়, ফুলের গহনা পরা, হাসিমুখ। সবাইয়েরই এক বয়স। আমি কাতরে কৃপা প্রার্থনা করলাম। তাঁরা আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

২৩শে ভাদ্র

সকালে আসনে বসার পর দেখলাম- একটি কুঞ্জবন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর খুব বড় ফটো রয়েছে। একখানি রাধাকৃষ্ণের ছবি রয়েছে। দেখতে দেখতে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেন। একবার শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী, একবার রাধা ও কৃষ্ণ,

এইভাবে দর্শন হতে লাগল। এমন সময় দুইগাছি ফুলের মালা ও ফুল এনে তাঁদের চরণে ফুল দিয়ে ও গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম।

২৪শে ভাদ্র

সকালে - আসনে বসার কিছুক্ষণ পরে দেখছি ব্রজমায়ীদের গ্রামে গিয়েছি। একজন ব্রজমায়ীকে বললাম, "আমার মাথায় আপনার পদরজঃ দিন।" কৃপা করে তিনি পদরজঃ দিলেন। তাঁদের সকলকে প্রণাম করে কৃপা ভিক্ষা করলাম। তখন তাঁরা বললেন, "মা এখন আর এ জিনিস কেউ চায় না, এমনভাবে চাইলে মিলে যায়।" খুব আনন্দ হচ্ছে, বলছি, "এখানে যতদিন থাকবো আমার গোপাল এসে ননী খেয়ে যাবে।" তাঁরা বললেন, "আমাদের গোপালের সঙ্গে তোমার গোপালও ননী খাবে।" কি মধুর ভাব ব্রজমায়ীদের! শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর কৃপায় জীবন ধন্য হয়ে গেল।

বিকালে - আসনে বসেছি, কিছুক্ষণ পর লীলা দর্শন আরম্ভ হলো - শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য বের হয়েছেন। সঙ্গে সখীরা। আনন্দে নৃত্যছন্দে সব চলেছেন। বনে গিয়ে অনেক ফুল তুলে সখীরা মালা গাঁথলেন। শ্রীমতী রাধারাণীকে ও শ্রীকৃষ্ণকে ফুলের সাজে সাজিয়ে দুখানি ফুলের সিংহাসনে বসালেন। ফুলের খাট ফুলের বিছানা। বড় বড় গোড়ের মালা দিয়ে সব সাজানো। কি সুন্দর অপূর্ব শোভা! বর্ণনা করার আমার সাধ্য নেই! স্বর্ণপ্রদীপ ঘৃতপূর্ণ করে জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। সখীরা ঘিরে ঘিরে নৃত্য করছেন। রাধাকৃষ্ণ খাটে শয়ন করলেন। কোন কোন সুখী ফুলের পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। মন্দির বন্ধ হলো। আমারও সে ভাব কেটে গেল। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর কৃপায় আমার আজ রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা দর্শন হলো।

২৫শে ভাদ্র

ভোরে - আসনে বসার কিছুক্ষণ পরে দর্শন হলো। একজন ব্রজমায়ী বলছেন, "খুব ভজন কর্ সব্ মিল যায়গা।" মাধুকরী হাতে দিলেন- ডাল রুটি; আবার বললেন, "নির্জন মে ভজন কর্ রাধারাণীকা কৃপা মিলেগা।" ব্রজমায়ী স্থুলাঙ্গিনী, ঘাগড়া পড়া, মাথায় ওড়না, গৌরাঙ্গিনী, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ।

২৬শে ভাদ্র

বিকালে - আসনে বসে নাম করছি। লীলা দর্শন হলো। প্রথম শ্রীকৃষ্ণ বলরাম অনেক সব সখাদের সঙ্গে গোষ্ঠ থেকে আসছেন, গরু-বাছুর আগে আগে আসছে। তাঁরা পেছনে। কৃষ্ণ বলরামকে অলকা তিলকা দিয়ে সাজানো। বলরামের হাতে শিঙা, কৃষ্ণের হাতে বাঁশি। তারপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা সামনে দেখলাম। পরে মণিকোঠায় দেখলাম। পরে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী, শ্রীশ্রীগুরুদেব ও আরোও অনেক মহাপুরুষ আছেন। সবাইকে চিনতে পারলাম না। সব ভাগবত আলোচনা করছেন।

২৭শে ভাদ্র

সকালে - আসনে বসার পর দেখলাম, গেরুয়া আল্‌খাল্লা পড়া দুই-তিনজন বাউল এর মত; বড় বড় করতাল নিয়ে কীর্তন করতে করতে যাচ্ছেন।

২৮শে ভাদ্র

সকালে - আসনে বসার পর দেখলাম, কুঞ্জমধ্যে রাধারানী ও সখীরা শ্রীকৃষ্ণের চোখ বেঁধে দিয়ে চোর চোর খেলা করছেন। সে কি ছুটোছুটি। কৃষ্ণতো হয়রান হয়ে কিছুতে না পেরে বসে পড়লেন। তখন সঙ্গীরা এসে চোখের বাঁধন খুলে দিলেন। রাধারাণীকে বামে বসিয়ে ফুল দিয়ে সাজালেন। কি সুন্দর শোভা! বর্ণনা করার শক্তি কোথায় ? অনেকক্ষণ সেই যুগল মিলন দেখার সৌভাগ্য হলো। তারপর সঙ্গীরা ও রাধারাণী গাগরি করে যমুনায় জল নিতে চলে গেলেন।

২৯শে ভাদ্র

সকালে - আসনে বসেছি। দেখছি - মা যশোদা কৃষ্ণ বলরামকে অলকা তিলকা দিয়ে গোষ্ঠের বেশে সাজাচ্ছেন। সেখানে আমার গোপালও গিয়ে মা যশোদার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মা যশোদা ননী খেতে দিলেন। কি অপূর্ব দৃশ্য! জীবন ধন্য হয়ে যাচ্ছে। একটা আশ্চর্য লাগছিল, কিছুই বুঝতে পারছিনা; শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীশ্রীরাধারাণীর সঙ্গে লীলা করেন তখন কিশোর বয়স দেখি। আবার যখন মা যশোদার কাছে থাকেন তখন বালক মূর্তি। মায়ের কাছে কত আবদার করছেন।

৩০শে ভাদ্র

সকালে - আসনে বসার অনেকক্ষণ পর লীলা দর্শন হলো। শ্রীমতী রাধারাণী সখীদের সঙ্গে সূর্যপূজা করবার জন্য বনে যাচ্ছেন। কি অপূর্ব বেশ! ঘাগড়া পড়া, রঙিন ওড়না, চরণে আলতা পরা। ফুলকাটা লাল টুকটুকে পা দুখানি। এখনো সেই দেবদুর্লভ চরণ দুখানি মানস চক্ষে ভাসছে। হাতে থালি ভরা ফুল। সবাই নৃত্য ছন্দে চলেছে। সেখানে ঝুড়ি ভরা অনেক পদ্মফুল রয়েছে। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী দুখানি আসনে বসে আছেন। পাশে শ্রীশ্রীগুরুদেব ও মা জননী দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে সখীরা বললেন, "এই ফুল সবাইকার চরণে দাও।" আমি আনন্দে সেই পদ্মফুল নিয়ে সবাইকার চরণে দিতে লাগলাম। তাঁরা বললেন, "আজ থেকে সেবার অধিকার পেলে।" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী, শ্রীশ্রীগুরুদেব, মা জননী ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ সবাইকার মিলন একসঙ্গে দেখে ধন্য হয়ে গেলাম। যা দেখছি, লিখবার ক্ষমতা নেই, তন্ময় হয়ে দেখছি। তারপর বললেন, "আবার দেখা পাবে।"

বিকেলে - আসনে বসার অনেকক্ষণ পরে দেখলাম, গেরুয়া আলখাল্লা পরা মাথার চুল চুড়ার মত বাঁধা একজন আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঊর্ধ্বে উঠে গেলেন। সেই স্থানে গিয়ে দেখি অনেক সাধু,মুনি,ঋষি সব ধ্যান করছেন। তিনি বললেন, "এ তপোলোক, এখানে কেউ আসতে পারে না গোঁসাইজী তোমাকে কৃপা করে দেখাতে আদেশ করেছেন।" দেখলাম বটে কিন্তু সকালে লীলা দর্শন করে অবধি মন আনন্দে ভরপুর হয়ে আছে, অন্য কিছু দেখার আগ্রহ নেই।

৩১শে ভাদ্র

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। কিছুক্ষণ পর লীলা দর্শন হলো। সঙ্গীরা সব আমাকে বললেন। "চলো আজ গোবর্ধনে উৎসব আছে। তাঁদের সঙ্গে গেলাম। সেখানে দেখি বিরাট ব্যাপার। কত ভোগ সাজানো রয়েছে - পুরি, মালপোয়া, বড় বড় বোঁদের নাড়ু। বড় বড় থালায় করে দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী, শ্রীশ্রীগুরুদেব, মা জননী রয়েছেন। আরোও অনেক ব্রজমায়ীরা রয়েছেন। গোবর্ধনের পূজা হলো। সবাইকে প্রণাম করলাম। সেখানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে প্রণাম করে

কৃপা ভিক্ষা করলাম। তিনি খুব স্নেহ করে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। আমার হাত খানি ধরে একটি সখীর হাতে দিয়ে বললেন, "একে দেখো, তোমার হাতে দিলাম।" আমার তখনকার সেই অবস্থায় যে কি অসীম আনন্দ হল সে আর কি বলব। আমি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কে বললাম, "অমুক কেও আশীর্বাদ করুন।" তখন তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "অমুকের শান্তি লাভ হোক।" শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সেই পবিত্র স্নেহপূর্ণ জ্যোতির্ময় মুখখানি দেখে প্রাণের ভেতর আনন্দের ঢেউ বইতে লাগলো। ......কে আশীর্বাদ করলেন - তাতেও আমার আনন্দ হল। মালপোয়া প্রসাদ দিলেন।

বিকেলে - আসনে বসে আছি। সেই গেরুয়া আল্‌খাল্লা পরা, মাথার চুলগুলি চূড়ার আকারে বাঁধা, তাতে হরিনামের মালা জড়ানো, আমাকে নিয়ে উর্দ্ধে উঠলেন। এক স্থানে গিয়ে বললেন, "এই ব্রহ্মলোক। সেখানে দেখলাম, সব মুনিরা উজ্জল মূর্তি। এক একটি অগ্নিকুন্ডে হোম করছেন। আর সুর তান যোগে বেদ পাঠ করছেন। ধুপ ধুনা হোমের সুগন্ধে একটি পবিত্র সত্ত্ব ভাব জেগে উঠছে। সমস্ত স্থান গম্‌গম্‌ করছে। কি যে দেখলাম প্রকাশ করে বলবার আমার কোনো ক্ষমতা নেই। তখন সেই সাধুবাবাকে বললাম, "আমাকে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী'র কাছে দিয়ে আসবেন চলুন। এইসব অপূর্ব জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছি।" তখন তিনি হেসে বললেন, "মা তোমার গুরু কৃপায় তোমার দেখার শক্তি হয়েছে; নতুবা এতক্ষণ মোহ প্রাপ্ত হয়ে যেতে। একমাত্র সদ্‌গুরুর কৃপা ছাড়া এসব দর্শন দুর্লভ। তুমি সৌভাগ্যবতী, তোমার উপর কোন গোঁসাইজীর অপার করুণা।" তারপর শেষে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী'র কাছে আমাকে দিয়ে গেলেন। তাঁকে বললাম, "আপনি কে অনুগ্রহ করে বলুন।" তিনি বললেন, "আমার পরিচয় পরে বলব।" তারপর শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে প্রণাম করলাম। তাঁরা আশীর্বাদ করলেন।

মা-মণি

১লা আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। কিছুক্ষণ পরে শ্রীগুরুদেবকে দর্শন হল। বললাম, "আজ লীলা দর্শন হল না।"

তিনি বললেন, "নাম কর মা, সব হবে।" আবার বললাম,"...... কি এখানে আছে ?"
তিনি বললেন, "আছে, দেখবে?"
আমি - "যদি আপনার ইচ্ছা হয় তো দেখাবেন।"
শ্রীগুরুদেব বললেন, "দেখতে পাবে, আসক্তি থাকতে দর্শন হয় না।"
বিকালে - আসনে বসার পর সেই গেরুয়া আলখাল্লা পরা সাধু বাবা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। একটা প্রকাণ্ড ধবল পাহাড়। তার উপর শিবলিঙ্গ আকারের বিরাট মন্দির। আমরা যেতেই বাবা নন্দীকেশ্বর দুয়ার খুলে দিলেন। সাধুবাবা বললেন, "এ কৈলাস পর্বত"। সেখানে দেখি শিবদুর্গার অপূর্ব মিলন। ভোলানাথ বাঘছাল পড়া, মাথায় জটাতে সাপ জড়ানো আছে। হাতে ত্রিশূল, বামঅঙ্কে মা ভবানী রাজরানীরূপে বসে আছেন। আমি প্রণাম করলাম, তাঁরা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর মা অন্নপূর্ণা হাতে কিছু অন্ন দিয়ে বললেন,"খাও"।
আমি - "আজ যে একাদশী"।
মা তখন কি মধুর হাসি হেসে বললেন, "এ মহাপ্রসাদ"।
তখন আমি সেই মহাপ্রসাদ পেলাম, খুব আনন্দ হল।
আসবার সময় বাবা নন্দীকেশ্বর কে প্রণাম করলাম, আশীর্বাদ করলেন- "মঙ্গল হোক"। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

২রা আশ্বিন

সকালে - আসনে বসার পর দর্শন হলো। সখীরা সব যমুনায় স্নান করতে যাচ্ছেন, আমিও সঙ্গে গেলাম। আমি তখন ঝারির জলে সকলকার চরণ ধোয়ালাম। সেই দেবদুর্লভ পাদোদক খেয়ে ফেললাম। কি সুন্দর সদ্‌গন্ধ, প্রাণ ঠান্ডা হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় বাঁশিটা হাতে করে দাঁড়িয়েছিলেন, রাধারাণীকে সখীরা তাঁর বামে দাঁড় করিয়ে দিলেন। জড়াজড়ি করে দুজনে এক হয়ে গেলেন, কি মধুর দৃশ্য ! এই অপূর্ব মিলন তন্ময় হয়ে দেখছি। ক্রমে সব মিলিয়ে গেল। তারপর দেখছি জ্যোতির্ময়রূপে শ্রীগুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন। সেইখানে গোপীবেশে ...... উজ্জ্বল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর শ্রীগুরুদেব ও ...... অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কোন কথা হল না।

বিকালে - আসনে বসে আছি, সেই আলখাল্লা পরা সাধুবাবা এসে নিয়ে গেলেন। এক স্থানে গিয়ে বললেন, "এই মানস সরোবর সরোবর।" সেই সরোবরের শোভা ধারণার অতীত। প্রকাণ্ড পদ্মফুল জলে ফুটে আছে। বড় বড় সাদা সাদা রাজহাঁস বিচরণ করছে। সরোবরের পাড়ে বড় বড় বৃক্ষে সাদা সাদা ফুল ফুটে রয়েছে, সেই স্থান সুগন্ধে ভরে গিয়েছে। নানা জাতীয় ফলের গাছ ফলে ভরে আছে, সেসব ফলের নাম জানিনা। নানা রকমের ফুলও ফুটে আছে। মুনি-ঋষিরা স্নান করছেন। আমাকে সেই সরোবরের জল মাথায় দিতে বললেন। আমি প্রণাম করে সরোবরে নেমে সেই জল মাথায় দিলাম। শ্রীশ্রীসদগুরুর কৃপায় মানস সরোবরের জল স্পর্শ করে জীবন ধন্য হলো। কি দেখছি, কি লিখবো লিখে জানাবার শক্তি আমার নেই।

৩রা আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। অনেকক্ষণ পরে দেখি, বনেতে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সখারা সব রয়েছেন। থালা থালা করে অন্ন, ডাল নিয়ে ঋষিপত্নীরা দিয়ে গেলেন। তখন দেখি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী, শ্রীশ্রীগুরুদেব, মাজননী, শ্রীমতি

রাধারানী, সখীরা রয়েছেন। এই অন্ন, ডাল সবাই খেলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ডাল অন্ন মেখে একটি নাড়ুর মতো করে আমার হাতে দিলেন। আমি প্রসাদ করে দিতে বললাম, তিনি দাঁত দিয়ে একটু কেটে নিয়ে আমাকে প্রসাদ করে দিলেন। সেই মহাপ্রসাদ খেয়ে খুব আনন্দ হল। তারপর শ্রীশ্রীগোঁসাইজী,শ্রীশ্রীগুরুদেব,মাজননী সবাই খেয়ে খেয়ে প্রসাদ করে আমার হাতে দিলেন। এমন সময় গোপাল এসে প্রসাদ খাইয়ে দিলে সে স্থান আনন্দবাজার হয়ে গেল। তারপর দেখি ...... সখীবেশে একটি সাজি করে অনেক ফুল নিয়ে এলো। আমি সেই ফুল নিয়ে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী, শ্রীগুরুদেব, মাজননী সকলের চরণে দিচ্ছি, এমন সময় দাদামশাই এসে শ্রীগুরুদেবকে বললেন, "দেখে ধন্য হয়ে গেলাম।" তখন শ্রীগুরুদেব আমাকে তাঁর পায়ে ফুল দিতে বললেন। আমি ফুল দিতে গেলে তিনি বিব্রত হয়ে ছুটে পালাতে লাগলেন। তখন সবাই খুব হেসে উঠলেন। তিনি আনন্দে খুব নৃত্য করতে লাগলেন। সেই আনন্দের মেলা দেখে ধন্য হয়ে গেলাম। খুব নামের কৃপা হতে লাগলো।

৪ঠা আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। দেখলাম শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী, বাবা বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণা। মা অন্নপূর্ণা আমার হাতে মহাপ্রসাদ দিলেন(সাদা অন্ন)। কিছু খেলাম কিছু আঁচলে বেঁধে রাখলাম। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বসে আছেন। শ্রীগুরুদেব ও মা জননী এলেন। মা যশোদা গোপালকে ননী খাওয়াচ্ছেন। রাধারানী ও সখীরা রয়েছেন। সেখানে আমাকে দেখিয়ে একজন সখী আর একজন সখীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ দীক্ষা পেয়েছে ?" তখন সেই সখী বললেন, "ললিতার কাছে পেয়েছে।" তখন সবাই আনন্দ করে আমায় আশীর্বাদ করলেন। (কাল গোবিন্দজীকে মন্দিরে দর্শন করতে গিয়েছিলাম। ভীড়ের মধ্যে দেখে তৃপ্তি হয়নি। আজ মনে হচ্ছে গোবিন্দজী যদি দেখা দেন তাঁর ভুবনমোহন রূপে, আমার হৃদয় মধ্যে বামে প্রেমময়ী শ্রীমতি রাধারাণী কে নিয়ে)। তখন দেখলাম শ্রীগোবিন্দজী রাধারাণীকে বামে নিয়ে আমার হৃদয় মাঝে ফুটে উঠলেন। সেই অপূর্ব মনমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে রইলাম। তারপর ...... এসে বললেন, "তুমি এখানে এসেছ খুব আনন্দ করো। আমরা এই নিত্যানন্দে ডুবে আছি। দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত, সকলকে দর্শন করে প্রণাম করে আনন্দে হরিধ্বনি করতে লাগলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করলাম, বললেন, "মা সদ্গুরুর কৃপায় জীবন ধন্য হয়ে যাবে, সব সময় নামানন্দে ডুবে থাকো।" গোবিন্দজী ও রাধারাণী বসে আছেন- লাল টুকটুকে চরণ। গোবিন্দজীর চরণে কিসের সব দাগ রয়েছে। তখন মনে হল সেসব বজ্রাঙ্‌কুশ চিহ্ন। নিজেকে ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে দেখছি। আমি বললাম, "দুজনে বাঁশিটি ধরে একবার বংশীধ্বনি করো।" একজন সখি বললেন, "এখন শ্রীবৃন্দাবনের প্রেম রসে ডুবে যাচ্ছ, বাঁশি সুনলে উন্মাদিনী হয়ে ছুটে বেড়াবে। ভজন ছুটে যাবে। এই প্রেম যখন গাঢ় হবে, হৃদয়ে ধরবার শক্তি হবে, তখন বাঁশি শুনতে পাবে। এখন নামরসে ডুবে লীলা দর্শন কর, সদ্গুরুর কৃপায় সব হবে।" তারপর শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী, রাধাকৃষ্ণ একসঙ্গে মিশে গেলেন।

বিকালে - আসনে বসে নাম করছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী দাঁড়িয়ে আছেন,এমন সময় সেই আলখাল্লা পরা সাধুবাবা এলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী তাঁকে বললেন, "একে পিতৃলোকে নিয়ে যাও।" তাঁর সঙ্গে পিতৃলোকে গিয়ে দেখি কয়েকজন সাধু বসে আছেন। কেউ

পাঠ করছেন, কেউ জপ করছেন, কেউ ধ্যান করছেন। সকলে সাদা ধবধবে কাপড় পরা, সাদা উড়ানী গায়ে, শান্তভাব। তার মধ্যে আমার পরলোকগত পূর্বপুরুষ একজনকে দেখলাম। তিনি আমাকে দেখে আনন্দ করলেন। প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ করে বললেন, "......আমার বংশে জন্ম নিয়ে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছ। তুমি কাল হাতে করে যমুনার জল আমাদের দিও।"

৫ই আশ্বিন

সকালে আসনে বসে যমুনার জল নিয়ে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে দিলাম। তখন দেখলাম হাতের ওপর অনেক হাত পাতা রয়েছে। আমি তো মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না, নিজ ইষ্টমন্ত্রে যতই জল ঢালছি ততই হাতের উপর হাত পাতা দেখছি, কিছুই বুঝলাম না। কিছুক্ষণ পরে নাম করতে বসলাম- দেখি, সখীরা এসে বলছেন চল যমুনাতে চল। আমি তাঁদের সঙ্গে গেলাম। যমুনাতীরে একস্থানে অনেক ফুল রয়েছে। একজন সেই ফুল নিয়ে আমাকে যমুনামায়ীর পূজা করতে বললেন। তখন দেখি জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি জলের উপর ভাসছেন। সর্ব অঙ্গে অলংকার ঝলমল করছে। মাথায় সোনার মুকুট। জলের উপর পদ্মফুলের উপর বসে আছেন। সখীরা উলুধ্বনি করল। আমি তাঁকে পূজা করে প্রণাম করলাম। তারপর সব অদৃশ্য হয়ে গেল। যমুনার তীরে তমালতলায় শ্রীমতি রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের অপূর্ব মিলন দেখে ধন্য হলাম। তাঁরা সব একসঙ্গে মিশে গেলেন। আনন্দে আমার প্রাণ পূর্ণ হয়ে গেল।

৬ই আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। অনেকক্ষণ পরে লীলা দর্শন হল। যমুনার ধারে একটি কুঞ্জমধ্যে রাধারানী, সখীরা সব রয়েছেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করতে করতে এলেন। সব বড় বড় ফুলের মালা চরণ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে। ফুল লতা পাতা দিয়ে সে স্থান সব সাজানো। সখীরা রাধারানীকে শ্রীকৃষ্ণের বামে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বাঁশিটি দুজনেই ধরেছেন। রাধারানী দক্ষিণে হেলে শ্রীকৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরেছেন আর শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীকে বামে হেলে জড়িয়ে ধরেছেন। সখীরা ফুল
ছোড়াছুড়ি করছেন। আমি কতকগুলি ফুল নিয়ে তাঁদের চরণে দিলাম। দেখি শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিনে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী দাঁড়িয়ে আছেন আর রাধারানীর বামে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী দাঁড়িয়ে আছেন।

সখীরা ঘিরে ঘিরে নৃত্য করছেন। মুন্ডিত মস্তক কমন্ডলু হাতে, কি স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চেয়ে দেখছেন। আবার নুপুরধ্বনি করে নৃত্য করতে করতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এলেন। কি সব অপূর্ব সুন্দর মূর্তি। এসব যা শ্রীশ্রীগোঁসাইজী দয়া করে দেখাচ্ছেন তা লিখে জানানো অসম্ভব। এমন কোন ভাষা আমার জানা নেই যাতে এইসব লীলা লিখে বা বলে প্রকাশ করতে পারি। এ কেবল্ একমাত্র সদগুরুর কৃপায় আমার দর্শন হচ্ছে। সেখানে সব প্রেমে মাতোয়ারা। প্রেমের বন্যায় আমি ভাসছি। সদ্‌গুরুর কৃপায় এই ব্রজলীলা দর্শন লক্ষ লক্ষ জন্মের সুকৃতির ফল। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা, যেন এ অবস্থা থেকে বঞ্চিত না হই। প্রাণ ভরপুর, আনন্দময়, এ আনন্দের তুলনা নেই। শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রনাম করলাম। তারপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই যে

মহাপ্রভুদত্ত প্রেমভক্তি, সবাই কেন এই জিনিস পায় না ?" তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী মধুর সুরে বললেন, "স্থুলের উপরই সবাইয়ের লক্ষ্য, সুক্ষ্ম জিনিস কেউ ভাবে না তাই এই মাধুর্য্য পায় না, উপর দেখেই তারা সন্তুষ্ট, ভিতর কেউ দেখেনা।" তারপর সব অদৃশ্য হয়ে গেলো। তখন সেই প্রভু নিত্যানন্দের নৃত্য চোখের উপর ভাসছে। নামে ভিতর গর গর, শরীর অবশ, অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতস্থ হলাম।

বিকেলে - আসনে বসে দেখলাম শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর কাছে সেই আলখাল্লা পরা সাধুবাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি তখন শ্রীশ্রীগোঁসাইজীকে বললাম, "আজ আমি রাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শন করব, সাধুবাবার সঙ্গে যাবনা।" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী তাঁকে কি বললেন তিনি চলে গেলেন। লীলা দর্শন হতে লাগল; সন্ধ্যা হয়েছে, সখীদের সঙ্গে রাধারানী অভিসারে যাচ্ছেন। সখীরা হাতে থালায় করে সর, ননী, ক্ষীর, ফল সব নিয়েছেন। আমাকে একজন বললেন আজ নিধুবনে মিলন হবে। আমিও তাঁদের সঙ্গে গেলাম, তখনও শ্রীকৃষ্ণ আসেননি। অনেক ঝুড়ি ফুল ছিল, তা দিয়ে কুঞ্জ সাজানো হলো। রাধারাণীকে ফুলের গহনা দিয়ে সাজানো হলো। এমন সময় বংশী হাতে শ্রীকৃষ্ণ এলেন। সখীরা রাধারানীকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বামে বসিয়ে দিলেন। দুগাছি মালা শ্রীরাধাকৃষ্ণকে পরানো হল। আমাকে তখন সখীরা বললেন, "তুমি এঁদের চরণ ধুয়ে দাও।" আমি তাঁদের চরণ ধুয়ে সেই অমৃত পান করে ধন্য হয়ে গেলাম। আমার ভাগ্যের কথা কি বলব, সদ্‌গুরু কৃপা করে এই অবস্থার মধ্যে রেখেছেন। তারপর তাঁদের হাতে জল দিলাম। তাঁরা হাত ধুয়ে খেতে বসলেন। সখীরা ফুলের মালা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। খাওয়ার পর হাতে জল দিলাম। তাঁরা হাত মুখ ধুলেন। একজন সখী হাত মুখ মুছিয়ে দিলেন। আমাকে সেই সর, ননী, ক্ষীর প্রসাদ দিলেন এবং সেই ভূবনমোহন যুগলরূপ দর্শন করতে বললেন। আমি প্রাণ ভরে দেখেছি আর আনন্দ সাগরে ডুবে গিয়েছি।

৭ই আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে নাম করতে করতে দেখছি, শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা রয়েছেন। সেই আলখাল্লা পরা সাধুবাবা দাঁড়িয়ে আছেন। আমি শ্রীশ্রীগোঁসাইজীকে বললাম, "সাধুবাবা এখুনি আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন, আমি এ বেলা যাব না।" তখন শ্রীশ্রীগোঁসাইজী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে হাসতে হাসতে বললেন, "কাল বিকেলেও যায়নি" বলে আমাকে বললেন, "মা, যেসব স্থানে তোমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে তোমাকে যেতেই হবে, তাতে তোমার মঙ্গলই হবে।"

আমি- "মঙ্গল অমঙ্গল জানি না আপনাদের কাছে থাকতেই আমার ভাল লাগে। এই দেহতেই হোক বা দেহ ত্যাগ করেই হোক আপনাদের কাছে আমার এই প্রার্থনা যেন সঙ্গছাড়া করবেন না।" তখন শ্রীশ্রীগোঁসাইজী সহাস্য বদনে বললেন, "তাই হবে মা, এরপর তুমি যে অবস্থা লাভ করতে চাও তাই পাবে, আমাদের কাছে অনন্তকাল থাকবে। সবসময় আসনে বসলেই আমাদের দেখা পাবে, লীলা দর্শন হবে। এখন নাম কর। সর্বদা নাম কর, নামের মধ্যেই সব দেখতে পাবে। রাত্রে বসতে পারলে ভাল হয়, চেষ্টা করলে হয়ে যাবে। এরপর সুন্দর অবস্থা লাভ হবে। আমি সবসময় তোমাদের কাছে আছি।"

বিকালে - আসনে বসে আছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। সেই সাধুবাবা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী তাঁকে যেন কি বলছিলেন। কি করে যে নিয়ে যান কিছুই জানতে পারিনা। চেয়ে দেখি কোথায় এসেছি। মা গঙ্গা, কত সব জ্যোতির্ময় পুরুষ স্নান করছেন, কোথাও হরিসংকীর্তন হচ্ছে। কেউ জপে মগ্ন হয়ে আছেন। আমাকে সাধুবাবা স্নান করতে বললেন, আমি সাহস পাচ্ছি না, দাঁড়িয়ে আছি। সাধুবাবা ধরে তিনবার জলে ডুবিয়ে তুলে আনলেন, খুব আনন্দ হল। জিজ্ঞাসা করলাম, "এ গঙ্গার নাম কি ? এ কোন স্থান ?" সাধুবাবা বললেন, "এ গঙ্গার নাম মন্দাকিনী। এখানে সদ্‌গুরুর কৃপা ছাড়া কেউ আসতে পারেনা।" তারপর শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কাছে নিয়ে এলেন। আমি ছুটে যেয়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে জড়িয়ে ধরে বলছি, "সাধুবাবা আজ আমাকে তিনবার গঙ্গায় ডুবিয়েছিলেন। খুব ভাল লেগেছিল।" তিনি বেশী কথা বললেন না, আদর করে পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজীকে বললাম, "কি যে দেখছি, কোথায় যাই, কি ভাবে যাই, কিছুই বুঝতে পারিনা। ভিতর আনন্দে পূর্ণ হয় কিন্তু আপনাদের সঙ্গে যে আনন্দ পাই তার তুলনা নেই।" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "মা, সবাইকেই নিয়মের মধ্য দিয়ে চলতে হয় ; এসব দূর্লভ অবস্থা। পথের সন্ধান করে দেয়। অনেক পরীক্ষা কষ্ট তোমার জীবনে গিয়েছে আর দেরী নেই, এবার তুমি যে অবস্থা পাবে তাও দূর্লভ। এইসব লিখে রাখ।" আমি বললাম, "লিখতে বলছেন লোক যদি বিশ্বাস না করে ?" তখন তিনি বললেন - " তুমি লোকের জন্য লিখছো না। সত্যকথা লিখবে, এতে কারও কিছু অবিশ্বাস করবার নেই। সত্যকথা বলতে কখনও ভয় পেও না, সত্য সবসময়েই সত্য ; যে অবিশ্বাস করবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।"

৮ই আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে প্রণাম করলাম। দেখলাম যমুনার তীর। সখীরা সব যমুনার জলে মুখ বার করে ডুবে আছেন। জলে যেন পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। আমি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কাছটিতে বসে এইসব দেখছি। সখীদের, রাধারাণী'র সকলের কাপড় যমুনার তীরে নামানো রয়েছে। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ এসে সব কাপড়গুলো নিয়ে কদম গাছের উপরে গিয়ে উঠে বসলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী খুব জোরে হেসে উঠলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী মৃদু মৃদু হাসছেন। আমি সখীদের যেয়ে বললাম, "শ্রীকৃষ্ণ যে তোমাদের সব কাপড় নিয়ে কদম গাছে উঠে বসে আছে।" রাধারাণী মাঝজলে ছিলেন। সবাই তখন কাপড় চাইতে লাগলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী দেখছেন আর হাসছেন। আর দেখতে পেলাম না। তারপর দেখলাম শ্রীশ্রীগোঁসাইজী পাঁচ-ছয় বছরের কালো প্রিয়দর্শন একটি ছেলেকে ধরে বসে আছেন। আমাকে বললেন, "একে চিনতে পারছো ?" দেখলাম- "গোবিন্দজী"। শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর কোলে মুখ লুকিয়ে মিট্‌মিট্ করে আমাকে দেখছে আর হাসছে। কি সুন্দর ভাব! এসব দর্শন একমাত্র ঠাকুরের কৃপায় হচ্ছে। শ্রীবৃন্দাবনে এসে একমুঠো প্রসাদ খেয়ে থাকতে পারব কিনা এই ছেলেটিকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আর একবার দেখবার ইচ্ছা ছিল। গোবিন্দজী কৃপা করে আজ দেখা দিলেন।

বিকালে - আসনে বসার পর দেখলাম তমালতলায় যমুনার ধারে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বসে আছেন। সখীরা কেউ মালা গাঁথছেন, কেউ ফুল তুলছেন। শ্রীগুরুদেব ও মাজননী বসে আছেন। রাধাকৃষ্ণও বসে আছেন। এক একবার

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী, শ্রীগুরুদেব ও মাজননী সবাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছেন, এক একবার পৃথক পৃথক দেখছি। কিছুই বুঝতে পারছি না। এমন সময় সেই সাধুবাবা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। দেখি একটা মনোরম তপোবন। অনেক মুনি পত্নী সব রয়েছেন। সাধু বাবা বললেন, "এ বশিষ্ঠ দেবের আশ্রম।" একটি জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীলোক ঘরে(লতাপাতায় ছাউনি ছোট কুটির)ছিলেন। বাইরে এসে সাধুবাবাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি পরিচয় দিতে খুব আনন্দ করে আমাকে বসতে বললেন। সাধুবাবা বললেন, "ইনি দেবী অরুন্ধতী।" আমি প্রণাম করলাম, তিনি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। একটি পাতার বাটিতে করে ফল প্রসাদ দিলেন। কমণ্ডলু করে ঠান্ডা জল দিলেন। আমি আল্‌গোছ করে তুলে সেই কমণ্ডলু থেকে জল খেলাম। একটু বসে চলে এলাম।

৯ই আশ্বিন

বিকালে - আসনে বসে নাম করছি, সেই সাধুবাবা এসে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখি সব উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। নৃত্যগীত হচ্ছে। জ্যোতির্ময় সব পুরুষ রয়েছেন। সাধুবাবা বললেন- "এ চন্দ্রলোক।" চলে এলাম। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বসে আছেন, তাঁকে বললেন, "এবার একে সপ্ততীর্থের জলে স্নান করালে তোমার কাজ শেষ হবে।"

১০ই আশ্বিন (দুর্গাষষ্টী)

সকালে - আসনে বসেছি। দেখলাম মা যশোদা গোপালকে কোলে করে ননী খাওয়াচ্ছেন। এমন সময় সখীরা রাধারাণীকে নিয়ে এলেন। মা যশোদা তাঁকেও কোলে বসিয়ে ননী খাওয়াতে লাগলেন। আমার গোপালও সেখানে সখীদের কাছে গিয়ে ননী খাচ্ছে।

বিকালে - আসনে বসে দেখছি মণ্ডপে দূর্গাপ্রতিমা আছেন আর প্রতিমার দক্ষিণ পাশে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী জ্যোতির্ময়রূপে দাঁড়িয়ে আছেন। বামপাশে শ্রীগুরুদেব ও মাজননী জ্যোতির্ময়রূপে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে খুব আনন্দে প্রাণ পূর্ণ হয়ে গেল। সেখানে আরতির পঞ্চপ্রদীপ, ধূপধুনা সব সাজানো রয়েছে। আমি সেসব নিয়ে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী, শ্রীগুরুদেব ও মাজননীকে আরতি করলাম। কৌটা ভরা সিঁদুর ছিল, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও মাজননীকে পরিয়ে দিলাম। ফুলের মালা ছিল তাঁদের গলায় পরিয়ে দিলাম। কি যে আনন্দ হচ্ছে কি বলবো। ঠাকুর সবই তোমার কৃপা, আমার কোন শক্তি নেই। আজ এই শুভক্ষনে ইষ্টপূজা করে পরিপূর্ণ আনন্দ পেলাম। শ্রীগুরুদেবের সেই জ্যোতিঃপূর্ণ চেহারা এখনও চোখে ভাসছে।

১১ই আশ্বিন (মহাসপ্তমী)

সকালে - আসনে বসে আছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আছেন। সেই সাধুবাবা এলেন, হাতে একটি কমণ্ডলু ছিল। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী কে দেখিয়ে বললেন, "এতে সমস্ত তীর্থের জল আছে। আজ দেবীর আবাহনের জন্য আনা হয়েছে।" তখন সেই জল আমার মাথায় ঢেলে দিলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী কে প্রণাম করে বললেন, "আর কোন আদেশ আছে, অনুমতি করুন।" তিনি বললেন, "এখন আর কোন কাজ নেই, মঙ্গল হোক" বলে আশীর্বাদ করলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে বললাম, "এইবার আপনার নামটি কি বলতে হবে।" তিনি মৃদু হেসে বললেন, "আমি গোঁসাইজীর

দাসানুদাস, আমার নাম উদ্ধব।" জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে।" বললেন, "প্রভুর ইচ্ছা হলেই হবে।" এই বলে চলে গেলেন। তারপর দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ বলরাম গোষ্ঠে যাচ্ছেন। কি সুন্দর সেজেছেন। সখারা সব সঙ্গে আছেন। মা যশোদা অনিমেষ নয়নে গোপালের পানে চেয়ে আছেন। সখীরা জল নিয়ে আসছেন, কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা। একজন সখী জিজ্ঞাসা করলেন, "কানাই আজ কোন বনে যাওয়া হবে ?"শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "কালিন্দীর তীর।" সখীরা সব চলে গেলেন।

বিকেলে - আজ প্রতিমা দর্শনে গেলাম। তিন স্থানে প্রতিমা দর্শন করে লালাজীর কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কে দেখতে গেলাম। ঠাকুরদালানে উঠে দর্শন করছি, এত বেগে নাম হতে লাগলো যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না। সেইখানেই বসে পড়ার ইচ্ছে হলো। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বসে পড়লে কখন উঠতে পারব তার ঠিক নেই। এসব জিনিস বাইরে প্রকাশ করবার নয়। তখন মনে মনে ঠাকুরকে ডাকছি। কোনরকমে বাড়ি যেতে পারলে হয়। তারপর গোপেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে তাঁর সখীবেশে নৃত্য দেখে একেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হবার অবস্থা হল। "ঠাকুর রক্ষা করো, জয় গুরুদেব" বলে ঠাকুরকে স্মরণ করছি। সেই অবস্থায় চলতে চলতে দেখি একটি সাত-আট বছরের ছেলে আমার বাঁ হাত খানি ধরল, তখন ভাবের মধ্যেই বলছি, "আমার সঙ্গে যে যাচ্ছ একলা আসবে কি করে ?" তখন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে তারই মত আরেকটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, এসে আমার ডান হাত খানি ধরল। তারা ধীরে ধীরে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এলো। আবার তাদের বললাম, "এবার দুজনে কি করে যাবে ?" তখন মেয়েটি আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখালে লালাজী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি তখনও স্থির হতে পারিনি। আসনে গিয়ে বসলাম, তখন দেখি সেই ছেলে মেয়ে দুটি কৃষ্ণচন্দ্র ও রাধারানী হয়ে যুগলরূপে দাঁড়ালেন। পাশে লালাজী জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী সেখানে বসেছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এসব কি দেখছি?" তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে বললেন, "দেখো দেখো খুব ভালো করে দেখো, প্রত্যক্ষ দর্শন বহু ভাগ্যে হয়।" আমি বললাম, "ভাগ্য বুঝি না, সবই আপনার কৃপায় আপনারই লীলারূপ দেখাচ্ছেন।" তিনি সহাস্যবদনে আমার দিকে চেয়ে অসীম আনন্দে ডুবিয়ে দিলেন।

১২ই আশ্বিন (মহাষ্টমী)

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। লীলা দর্শন হলো। সখীরা বললেন, "আজ যমুনার তীরে গিয়ে মা কাত্যায়নীর পূজা করতে হবে।" তখন ফুলের মালা, ফুল চন্দন প্রভৃতি পূজার উপকরণ নিয়ে সবাই চললেন। তাঁদের সঙ্গে আমিও চললাম। সেখানে যমুনার তীরে গিয়ে সব উপরে রেখে সবাই যমুনায় স্নান করলাম। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও সেখানে রয়েছেন। যমুনার তীরে মা কাত্যায়নীর পূজা করা হলো। আমিও সেই ফুল নিয়ে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর চরণে দিলাম। শ্রীকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন। সখীরা রাধারাণীকে নিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের বাম পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তাঁদের চরণেও ফুল দিলাম। সেই অপূর্ব দর্শন করে খুব আনন্দ হচ্ছে। ক্রমে সব অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বিকালে - আসনে বসে দেখলাম একটি কুঞ্জে পাঠ হচ্ছে। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, ব্রজমায়ীরা ও আরও অনেকে সব বসে পাঠ শুনছেন।

১৩ই আশ্বিন (মহানবমী)

সকালে - আসনে বসলাম। আজ আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের স্বধামে মহাপ্রস্থানের দিন। মনটা বড়ই ভারাক্রান্ত। নাম করছি, দেখলাম উজ্জ্বল রত্নসিংহাসনে শ্রীগুরুদেব জ্যোতির্ময়রূপে বসে আছেন। পাশে মাজননীও বসে আছেন। চারিদিকে জ্যোতির ছটা, প্রাণভরে সেই অপূর্ব রূপমাধুর্য দেখে সব কষ্ট চলে গেল। প্রাণ শান্তিপূর্ণ হল। জয় গুরুদেব! ধন্য তোমার লীলা।

বিকেলে - আসনে বসেছি। দেখছি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী রয়েছেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী শ্রীগুরুদেবকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। কখনো দুজনে এক হয়ে যাচ্ছেন, কখনো পৃথক দেখছি। সেইখানে অনেক ফুল ছিল। আমি ফুল নিয়ে শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর চরণে দিলাম। দেখতে দেখতে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশ্রীগোঁসাইজী একসঙ্গে মিশে গেলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর পাশে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী দেবীরূপে সেইস্থান আলো করে বসে আছেন। তাঁদের চরণেও ফুল দিয়ে পূজা করলাম।

১৪ই আশ্বিন (বিজয়া দশমী)

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। লীলা দর্শন হলো। একটি কুঞ্জবনে সখীরা সব বসে মালা গাঁথছেন। আমাকে বললেন, "আজ এখানে বনভোজন হবে। এখুনি সবাই আসবে।" অনেক সর, ক্ষীর, দই, ননী প্রভৃতি হাঁড়ি হাঁড়ি নামানো রয়েছে। নানারকম ফল ও লাড্ডু রয়েছে। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, শ্রীগুরুদেব, মাজননী, গোবিন্দজী, রাধারানী, সখীরা, সখারা সব চারিদিকে রয়েছেন। সখীরা সেইসব খাবার তাঁদের সবাইকে দিলেন। আনন্দ করে সবাই ভোজন করলেন। সখীরা কিছু কিছু প্রসাদ এনে আমার হাতে দিলেন। আমি আনন্দ করে সেই দেবদুর্লভ মহাপ্রসাদ পেলাম। এইভাবে আজ বিজয়ার উৎসব দর্শন হলো।

১৫ই আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে নাম করতে করতে দেখি শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে বাঁশিটি কেড়ে নেবার চেষ্টা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবেন না রাধারানীও ছাড়বেন না। সখীরা এসে শ্রীকৃষ্ণকে বলছে, "সকালে দুটিতে ঝগড়া লাগালে ? দাওনা একবার বাঁশিটি বাজাতে ইচ্ছা হয়েছে।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "রাধারাণী কি করে বাজাবে ? আমি ছাড়া কেউ বাজাতে পারে না।" সেখানে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসেছিলেন। আমি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী কে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাঁশি কি কৃষ্ণ ছাড়া কারোও হাতে বাজে না ?" তিনি বললেন, "রাধারানীর হাতে দিয়ে দেখনা, এখনই বাঁশি বেজে উঠবে, রাধা কৃষ্ণ যে এক।" শ্রীকৃষ্ণ তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। রাধারাণী রাগ করে বসে আছেন। মানিনীর মান দেখবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের এই এক লীলা। শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীকে বাঁশিটি দিতে গেলেন, তখন মানিনী মান করেছেন, মুখ ফিরিয়ে বসলেন। সখীরা সব দাঁড়িয়ে হাসছেন। এমন সময় শ্রীশ্রীগোঁসাইজী খুব জোরে হেসে উঠলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেলেন। রাধারাণীও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেলেন। তখন কেবল শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দেখতে লাগলাম, সখীরা সব নৃত্য করতে লাগলো। সেখানে পদ্মফুল ছিল। আমি তাঁদের চরণে দিয়ে প্রণাম করলাম।

বিকেলে - আসনে বসে আছি, খুব নাম হচ্ছে। একেবারে ডুবে গেলাম। দর্শন হলো না, বাহ্যজ্ঞান হলে দেখলাম ঘর খুব সুগন্ধে পূর্ণ, যেন (কতকটা) আতরের গন্ধ। কিছুই দেখতে পেলাম না। সেই মনপ্রাণ মাতানো গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

১৬ই আশ্বিন

সকালে - আসনে বসেছি। দেখলাম যমুনার ধারে কদম গাছে দোলনা খাটানো রয়েছে। সকালবেলাতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ দুলতে আরম্ভ করেছেন। সখীরা দোলনা ঠেলে দিচ্ছেন। জলের গাগরী সব যমুনার তীরে বসানো রয়েছে। আমাকে বললেন, "ঝুলন দেখতে পাওনি, এই দেখো ঝুলন।" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী , শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী একটায়, শ্রীগুরুদেব ও মাজননী আর একটা দোলনায় বসেছেন। সখীরা সকলেরই দোলনা ঠেলে দিচ্ছেন। কি সুন্দর দৃশ্য। মুগ্ধ হয়ে দেখছি। কোথায় যে আছি কিছুরই ঠিক নেই। তারপর সব মিলিয়ে গেল। আর কিছু দেখতে পেলাম না।

বিকেলে - আসনে বসে আছি। খুব নাম চলছে। সুষুম্নাপথে সরুনালে নাম চলায় ভিতরে একটা অনুভূতি হচ্ছে। যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে আনন্দের একটা ধারা বইছে।

১৭ই আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। কাল বিকেলের মতোই ভেতরটা মধুময় হয়ে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে রয়েছেন। ধীর সমীর কুঞ্জের শ্যামরায় এসে বলছেন, "আমাদের দেখলে না, চলো একবার দেখে আসবে।"

আমি – "এই তো তোমাকে দেখছি, আবার কি দেখতে যাব?" তখন আবার আবদার করে বলতে লাগলেন, "এইতো কাছে, বেশি দূর নয়।"

আমি – "এরপর যাব।" "না এখুনি চলো" বলে আবদার করতে লাগলেন।

আমি – "আমার তো মালা তিলক নাই, সাধন-ভজন কিছু করিনা, আমাকে এত ভালো লাগছে কেন?" তখন বললেন, "তোমার কিছুই দরকার নেই।" তখন শ্রীশ্রীগোঁসাইজীকে বললেন, "বলোনাগো যেতে, তুমি না বললে ও কিছুতেই যাবে না।" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "গিয়ে কি করবে?"
তখন শ্যামরায় বললেন, "আমার ইচ্ছা হচ্ছে একবার গিয়ে আমাকে দেখে আসুক।"
শ্রীশ্রীগোঁসাইজী আমাকে বললেন, "যাও মা শ্যামকে দেখে এসো।"
তখন আসন থেকে উঠে গিয়ে শ্যামরায়কে রাধারানীর সঙ্গে দেখে মোহিত হয়ে গেলাম। খুব জোরে নাম চলতে লাগলো।

আমি – "বটে এইজন্য বুঝি আমাকে নিয়ে আসা হল, লোকের কাছে লজ্জায় ফেলার জন্য।"
তখন শ্যামরায় ও রাধারানী আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।আমি তখন পালিয়ে এলাম।

বিকেলে - আসনে বসে নাম করছি। কোথায় কীর্তন হচ্ছে। সখীরা যাচ্ছেন, আমাকেও তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বললেন "কালিন্দীর তীরে কীর্তন হচ্ছে।" একটা কুঞ্জের দুয়ারে ঢুকছি, ফুল পাতা দিয়ে সাজানো একটি দরজা। আমাকে দেখে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "বহিরঙ্গ না অন্তরঙ্গ ?" সখীরা বললেন, "অন্তরঙ্গ।" পথ ছেড়ে দিলেন। ভিতরে গিয়ে দেখলাম ফুল লতা পাতা দিয়ে সাজানো তিনটি সিংহাসন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী; শ্রীগুরুদেব, মাজননী; রাধাকৃষ্ণ তিনটিতে বসে

আছেন। সেখানে শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু নৃত্য করছেন। মৃদঙ্গ(খোল) করতাল সব বাজছে। মধুর হরিধ্বনি চারিদিকে মুখরিত হচ্ছে। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের কি বর্ণনা করব। মহাসংকীর্তন। মধুর নৃত্য। শ্রীশ্রীগোঁসাইজীও নেমে এসে নৃত্যে যোগ দিলেন। সখীরাও মণ্ডলী আকারে ঘিরে ঘিরে নৃত্য করতে লাগলেন। তারপর হরিলুট হল। প্রসাদ দিলেন।

১৮ই আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। দেখলাম, রাধাকৃষ্ণ দুটিতে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বসে আছেন।

বিকেলে - আসনে বসে খুব নাম হতে লাগল। তারপর দেখি, সখীদের সঙ্গে শ্রীমতি রাধারানী নিধুবনে কৃষ্ণদর্শনে যাচ্ছেন। ভাবের ঘোর, আবেশে দেহ অবশ। ললিতা, বিশাখা দুজনে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে চমকে উঠেছেন। এক-একবার চারিদিকে চেয়ে যেন কি অনুসন্ধান করছেন। নিধুবনে গিয়ে দেখি শ্যামসুন্দর নিজ মনে বাঁশি বাজাচ্ছেন। সখীরা শ্রীমতিকে নিয়ে গিয়ে শ্যামের বামদিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। চারিদিকে বড় বড় ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হলো। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী, শ্রীগুরুদেব, মাজননী সবাই সেখানে রয়েছেন। সখীরা রাধাকৃষ্ণকে ফুলের পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। তারপর মন্দির বন্ধ করে দিয়ে সব চলে গেলেন।

১৯শে আশ্বিন

সকালে – আসনে বসেছি। দেখি, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সখারা সব এসেছেন। গরু বাছুর সব বাড়ি ভরে গেছে। কৃষ্ণ বলরাম গোষ্ঠবেশে সেজে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে বললেন, ”তোমার গোপালকে দাও আমাদের সঙ্গে গোষ্ঠে যাবে।“ মা যশোদা সেখানে ননী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। গোপালকে ননী খাওয়াতে লাগলেন। গোপাল কোলে বসে ননী খেল। তারপর সব চলে গেল। আগে আগে গরু বাছুর, তার পেছনে পেছনে কানাই বলাই ব্রজবালকরা চলছে।

২০শে আশ্বিন

সকালে – আসনে বসে দেখলাম শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। শ্রীগুরুদেব ও মাজননী দাঁড়িয়ে আছেন। প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ করলেন। তারপর দাদাগোঁসাই এলেন। আজই প্রথম দাদাগোঁসাইকে দেখলাম। বড় আনন্দ হল। পায়ে পড়ে প্রণাম করে প্রেমভক্তি ভিক্ষা করলাম। তিনি বললেন, “মা তুমি ভাগ্যবতী ; গোঁসাইজী বলেছেন, তুমি তাঁর বুকের জিনিস। এ সৌভাগ্য কার হয় ! নাম কর মা, আনন্দে ডুবে যাবে।“ আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর দেখি শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন মন্দিরে যেমন মূর্তি থাকে। আমি বললাম,”এসব নয়, আসলরূপে দুটিতে দাঁড়াও।“ তখন তাঁরা হেসে দুজনে জড়াজড়ি করে ধরে দাঁড়ালেন।

বিকাল – আসনে বসে দেখছি, শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। খুব বড় ফুলের মালা তাঁদের গলায় আছে। পাশেই শ্রীগুরুদেব ও মাজননী বসে আছেন, তাঁদের গলাতেও বড় বড় ফুলের মালা পরান রয়েছে। সেইখানে পদ্মফুল ছিল।

আমি নিয়ে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, শ্রীগুরুদেব ও মাজননীর চরণে দিলাম। তারপর দেখি রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ দুজনে ফুলের সিংহাসনে বসে আছেন। মধুর হাসি হাসছেন। আমি পদ্মফুল নিয়ে তাঁদের চরণেও দিলাম। এমন সময় সখীরা এসে আরতী করলেন। তখন রাধাকৃষ্ণ জড়াজড়ি করে দাঁড়ালেন। অপূর্ব দর্শন হল। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, শ্রীগুরুদেব, মাজননী, রাধা, কৃষ্ণ সব একসঙ্গে মিশে গেলেন। তারপর আর কিছু দেখতে পেলাম না।

২১শে আশ্বিন

সকালে - আসনে বসলাম। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শন হল। তারপর রাধারাণী ও সখীরা এলেন। সখীরা বললেন, "আজকে রাধাকে লুকিয়ে রাখবো। কানাই এসে যেন দেখতে না পায়। কি করে দেখতে হবে।" একটি কুঞ্জের মধ্যে রাধারাণীকে রেখে বাইরে সখীরা বসে আছেন। বাঁশি বাজাতে বাজাতে শ্রীকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন। সখীদের বললেন,"রাধাকে দেখ্ছিনা, রাধা কোথায় ?" সখীরা বললেন, "আজ রাধা আসতে পারেনি, তাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে।" এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে বসে পড়লেন। করুণ নয়নে সখীদের পানে চেয়ে বলছেন, "কোন উপায়ে তাকে আনতে পার না ? আমি রাধার বিরহ সহ্য করতে পারছি না।" ললিতা বললেন, "কূলের কূলবধূকে সব সময় বনে আসতে দেবে কেন?" শ্রীকৃষ্ণ কাতর হয়ে বলছেন, "তোমরা রাইকে এনে দাও।" তখন শ্রীকৃষ্ণের বিষাদময় মুখখানা দেখে সখীরা আর রাধাকে লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। কুঞ্জের ভিতর থেকে শ্রীমতিকে বাইরে এনে কৃষ্ণের পাশে বসিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আবেগভরে রাধাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি মুগ্ধ হয়ে এসব দেখছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী আমাকে বললেন, " এসব প্রাণ ভরে দেখ আর সব লিখে রাখ। এ সবই সত্য। লেখার মধ্যে সত্য জিনিসই থাকবে। এই বৃন্দাবনলীলা আমারও প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। মহাপ্রভু যা প্রকাশ করে গিয়েছেন, সে সবই তাঁর ভক্তরা নানা গ্রন্থে লিখেছে। এবার তোমাকে এনে এসব দেখান হচ্ছে। এই লেখার মধ্যে আমার শক্তি থাকবে।" আমি বললাম, "আপনার কত ভক্ত আছে তাঁদের দিয়ে কেন লেখাননি ?" তিনি তখন বললেন, "এইসব দর্শন হলে তারা মনে করবে তাদের সাধনের জোরে হচ্ছে। মনে অহংভাব আসবে। তোমার তো আর সে ভাব নেই। গুরুকৃপাই তোমার সম্বল। কাজেই এ জিনিস অন্য লোক লিখলে এইভাবের হবে না। এই আসল জিনিস হচ্ছে, সময় হলেই প্রকাশ হবে।"

বিকালে - আসনে বসেছি। দেখি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী দাঁড়িয়ে আছেন, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। বাবা গম্ভীরনাথ দাঁড়িয়ে আছেন। প্রণাম করলাম, সবাই আশীর্বাদ করলেন। নাথজী বললেন, "তোমার উপর গোঁসাইজীর অশেষ কৃপা। যেটুকু বন্ধন ছিল কাটিয়ে নিয়েছেন। অমূক অষ্টসখীর এক সখী, তোমার গুরুদেব সব জানতেন।" আমি- "আশীর্বাদ করুন যেন নামে ডুবে যাই।" তিনি বললেন, "তোমার কোন ভয় নেই, গোঁসাইজী সর্বদা তোমাকে রক্ষা করছেন।" তারপর এত নাম হতে লাগল, সেই আনন্দে একেবারে ডুবে গেলাম।

২২শে আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। দেখছি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, শ্রীগুরুদেব, মাজননী সবাই বসে আছেন। সবাইকে প্রণাম করলাম। আবার দেখছি

যমুনার তীর। সখীরা জল নিতে এসেছেন। গাগরীগুলি তীরে রেখে জলে নেমে সব জলখেলা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ এসে জলে নামলেন। শ্রীকৃষ্ণ, রাধারাণী, সখীরা সব জলে খেলা করতে লাগলেন। তারপর সব উপরে উঠে এলেন। কাপড় পড়লেন। রঙিন ওড়না সব মাথায় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন একটি কদমগাছের তলায় দাঁড়ালেন। সখীরা রাধারাণীকে কৃষ্ণের বামে দাঁড় করিয়ে দিলেন। জড়াজড়ি করে যুগলে বাঁশি ধরলেন। সেই ভুবনমোহন রূপ দেখতে দেখতে ডুবে গেলাম।

২৩শে আশ্বিন

সকালে - আসনে বসলাম। নাম চলছে। সব মধুময় হয়ে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আছেন। শ্রীগুরুদেব সেখানে আনন্দময় মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে অনেক পদ্মফুল ছিল। আমি তাঁদের চরণে দিয়ে প্রণাম করলাম। এই মধুর দৃশ্য দেখে জীবন ধন্য হয়ে যাচ্ছে। নামে ডুবে গেলাম। দেখি, একটি ছোট ছেলে ও একটি ছোট মেয়ে এসে আমার কাছে বসল। ফুলের মুকুট ও ফুলের গহনা পরা। আমি বললাম, " কে তোমরা ?" মেয়েটি বলল, "আমি রাধা", ছেলেটি বলল, "আমি কৃষ্ণ"।

২৪শে আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। প্রণাম করে কাছে বসলাম। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "আজ বাবা বিশ্বনাথ অনুরোধ করছিলেন তোমাকে একবার কাশীতে পাঠানোর জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি বললেন?"
শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, "এখন হবে না যাও।" তারপর দেখলাম রাধাকৃষ্ণ ও সখীরা যমুনার জলে সাঁতার কাটছেন। আমাকে সখীরা ডাকলেন। বললেন, "এস,সাঁতার দেবে এস।" আমি-"আমি সাঁতার জানিনা ডুবে যাব।" তখন একজন সখী এসে আমাকে ধরে নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিলেন। ডুবে গেলাম না। দেখি আমিও সাঁতার কাটছি। তাই দেখে তাঁরা খুব হেসে উঠলেন। সব মিলিয়ে গেল। দেখি ঘরে বসে নাম করছি।
বিকালে - আসনে বসে নাম করতে করতে ডুবে গেলাম। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করলাম। তারপর লীলাদর্শন হল। গোষ্ঠ থেকে কানাই, বলাই নন্দালয়ে এসে মা বলে ডাকতেই মা যশোদা ছুটে এসে গোপালকে কোলে নিলেন এবং বললেন, "আজ এত দেরি হল কেন ?"
গোপাল বলল, "আজ অনেক দূর বনে গিয়েছিলাম। মা তুমি বাঁশি শুনতে পাওনি ?" তখন মা যশোমতি বললেন, "আর অতদূরে যেও না বাবা।" "মা খেতে দাও বড় ঘুম পাচ্ছে"-নীলমণি বলল। যশোদারাণী তাড়াতাড়ি সর, ননী, নাড়ু সব এনে দিলেন। ব্রজবালকেরা প্রত্যেকদিন গোষ্ঠ থেকে ফিরবার পথে মা যশোদার কাছে খেয়ে যায়। সবাই একসঙ্গে বসে খেল। তখন গোপাল বলরামকে বলল, "দাদা তুমি মা রোহিনীর কাছে যাও, আমি ঘুমাতে যাচ্ছি," এই বলে একটা ছোট চালাঘরে গিয়ে শয়ন করল। আজ গোবিন্দ বংশীবটে গিয়ে বংশীধ্বনি করবেন। তারপর যমুনাপুলিনে গিয়ে যোগমায়া আশ্রয় করে মহারাস করবেন। যোগমায়া মায়াতে সবাইকে ভুলিয়ে দিলেন, কেউ কিছু জানতে পারলো না। কিছুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশিটি নিয়ে বংশীবটে গিয়ে বাঁশিটি বাজাতে লাগলেন। সেই বংশীধ্বনি শুনে গোপিনীরা যে যেই অবস্থায় ছিলেন উন্মাদিনী হয়ে সব ছুটে চলে এলেন। রাধারাণীকে দুজন সখী ধরে নিয়ে যাচ্ছেন।

প্রেমময়ীর সে এক অপূর্ব ভাব ! আমার সাধ্য কি যে বর্ণনা করি। আমাকে সখীরা কৃপা করে সঙ্গে যেতে বললেন। সখীরা, রাধারাণী সব যমুনা পুলিনে গিয়ে রাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের বামে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মণ্ডলীর আকারে সবাই ঘিরে ঘিরে নৃত্য করতে লাগলেন। মধ্যে রাধাকৃষ্ণ, চারিদিকে একটি সখীর মাঝে একটি শ্রীকৃষ্ণ। যত সখী তত কৃষ্ণ। অলাতচক্রের মত সব ঘুরছেন। কি দেখছি, কি লিখব ! ডুবে গেলাম। যখন ঠিক হলাম দেখি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন আর আমি তাঁদের কাছে বসে আছি। সেইখানে বসে দেখতে লাগলাম। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী আমাকে বললেন, "লিখে রেখো, অপূর্ব দর্শন মহাভাগ্যে হয়।" আমি - "আপনিই তো কৃপা করে আপনার এসব লীলা দেখাচ্ছেন। এই যে শ্রীবৃন্দাবনে এনে কৃপা করে শ্রীবৃন্দাবনলীলা দর্শন করাচ্ছেন। কি যে দেখছি কিছুই ধারণা করতে পারছিনা, আনন্দে প্রাণ ভরপুর হয়ে যাচ্ছে। লিখে রাখতে বলছেন, কিন্তু কি বর্ণনা করবো ! আমার সাধ্য কি ? ব্রজলীলা লেখা কি আমার সাধ্য ? আপনি শক্তি দিচ্ছেন বলেই একটু লিখতে পারছি।"
তিনি বললেন, " যা লিখবে তাতেই অনেক কাজ হবে।" তারপর সব অদৃশ্য হয়ে গেলেন।
ঠাকুর যা লেখাচ্ছেন তাই লিখছি।

২৫শে আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করলাম। দেখি কানাই, বলাই, ব্রজবালকরা সব গোষ্ঠে যাচ্ছে। মা যশোদা অলকা তিলকা দিয়ে সব সাজিয়ে দিলেন। সে রূপের শোভা কার সঙ্গে তুলনা দেব, অপরূপ দৃশ্য ! গাভী, বৎস সব আগে আগে চলছে আর ব্রজবালকরা সব নৃত্য করতে করতে পেছনে পেছনে চলেছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে গাভীরা পেছন ফিরে সব চেয়ে চেয়ে দেখছে। সখীরা যমুনায় জল নিতে যাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ কোথায় যাওয়া হবে ?" বললেন, "কালিন্দীর তীরে।" সখীরা এসে যমুনার জলে নামলেন। আমাকে ডাকলেন। বললেন, "সাঁতার দেবে এস।" আমি বললাম, "না, তোমরা সাঁতার কাট। আমি তোমাদের কাপড় আগলে বসে থাকি।" তখন একজন সখী বললেন, "কানাই আজ জব্দ হবে।" তাঁরা সব জলে নেমে খেলা করতে লাগলেন। জলে যেন পদ্মফুল ফুটে উঠলো। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। আমি তাঁদের কাছটিতে বসে দেখছি। **শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, " খুব নাম কর মা, দেখবে কোথায় ছিলে কোথায় এসেছ, নামের মধ্যেই সব তত্ত্ব প্রকাশ হবে।"** এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ এসে আমাকে বলছেন, "কাপড়গুলি দাও, দেখবে কেমন মজা হবে।" আমি বললাম, " তা কি হয়, আমার কাছে রেখে গেছেন।" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী হাসতে হাসতে বললেন, " আজ ফিরে যাও কাপড় পাচ্ছ না।" শ্রীকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন এবং শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর সঙ্গে মিশে গেলেন। ঠিক হয়ে দেখছি আসনে বসে নাম করছি।

২৬শে আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে তাঁদের কাছে বসলাম। দেখি একটি ছোট মেয়ে ও একটি ছোট ছেলে এসে দাঁড়াল। আমি বললাম, "কে তোমরা ?" মেয়েটি বলল, "সেই সেদিন এসেছিলাম, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলাম, ভুলে গিয়েছ ?" তখন মনে পড়ল কৃষ্ণচন্দ্র ও রাধারাণী।

মেয়েটি বলল, "তুমি আর গেলে না?" আমি - "কার সঙ্গে যাব, অমুক কাজে ব্যস্ত আছে।" ছেলেটি বলল, " আর একদিন যেও, আমরা এসে নিয়ে যাব।"
শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "অমুক ফিরে এলে একদিন যেও, ভজনের উপযুক্ত স্থান।" ছেলেটি ও মেয়েটি কি সুন্দর দেখতে ! শ্রীশ্রীগোঁসাইজী তাদের বললেন, " আচ্ছা একদিন যাবে।" তখন দুজনে হাত ধরাধরি করে চলে গেল। আমি তখন শ্রীশ্রীগোঁসাইজীকে বললাম, "এবার পুরী গিয়ে আপনাকে, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দেখতে পাব তো ?" তিনি বললেন, "যখনই দেখতে ইচ্ছা হবে আসনে বসলেই দেখতে পাবে।" এমন সময় শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এসে শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর কাছে বসলেন। আমি প্রণাম করলাম। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু সবাই কথা বলতে লাগলেন। সে ভাষা আমি বুঝতে পারলাম না। শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু চলে গেলেন। আমি শ্রীশ্রীগোঁসাইজীকে বললাম, "আপনারা কি সব ভাষায় কথা বললেন আমি বুঝতে পারলাম না।"

২৮শে আশ্বিন

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। দেখি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, শ্রীগুরুদেব, মাজননী সব রাধাকুন্ডের তীরে বসে আছেন। সখীরা, রাধারাণী, শ্রীকৃষ্ণ কুন্ডে সাঁতার দিচ্ছেন। আমায় ডাকলেন, বললেন, "স্নান কর এসে।" আমি - "আমি ডুবে স্নান করতে পারিনা।" তখন একজন সখী জল থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে জলে নেমে ছেড়ে দিলেন। আমি ডুব দিলাম। আবার তাঁরা আমাকে শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর কাছে উঠিয়ে দিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "আজ অষ্টমী তিথিতে রাধাকুন্ডের সৃষ্টি হয়েছিল, সেইজন্য আজ সবাই স্নান করে। এতে যখন স্নান করবে সর্বতীর্থের জলে স্নান করা হবে।" আমি বললাম, "আমার তো স্নানের কোন উপায় ছিল না, শ্রীবৃন্দাবনে ছিলাম, এখানে কি করে এলাম, কিছুই বুঝতে পারলাম না, আপনিই আমাকে এনেছেন।" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী হাসতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ, রাধারাণী, সখীরা সবাই জল থেকে উঠে এলেন। কাপড় পরে সবাই সেখানে বসলেন। সখীরা অনেক ফুল তুলে আনলেন। বড় বড় মালা গাঁথা হল। ফুলের আসনে রাধাকৃষ্ণকে বসান হল, দুজনার গলায় মালা পরান হল। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, শ্রীগুরুদেব, মাজননী - তাঁদেরও গলায় মালা পরান হল। সেই ফুল নিয়ে আমি সবার চরণে দিয়ে প্রণাম করলাম। তখন সখীরা পদ্মফুল দিয়ে রাধারাণীর চরণ দুখানি ঢেকে দিলেন। তারপর সব অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিকালে - আসনে বসে নাম করছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। শ্রীগুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন। বীণাযন্ত্রে হরিনাম করতে করতে দেবর্ষি নারদ এলেন। আমি তাঁকে বললাম, "আপনি শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা করে এলেন, আমার মাথায় আপনার শ্রীচরণের রজ দিন।" দেবর্ষি বললেন, "মা, আমি তো শ্রীবৃন্দাবনের রজে পা লাগবে বলে রজে পা দিই না। শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থল। তাঁদের পদরজে সমস্ত বৃন্দাবন ভূষিত, সবই রজ। যত লীলা করেছেন জীবন্ত ভাবে এখনও তেমনই হচ্ছে, যে ভাগ্যবান সে দেখতে পায়। তুমি সদগুরুর কৃপালাভ করেছ বলেই দেখতে পাচ্ছ। গোঁসাইজী তোমাকে সব দেখাচ্ছেন।" যাবার সময় শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

২৯শে আশ্বিন

সকালে – আসনে বসে নাম করছি। দেখি, সেখানে খুব জ্যোতিঃপূর্ণ একটি আট নয় বছরের বালিকা মূর্তি। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৩০শে আশ্বিন

সকালে – আসনে বসে আছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আসনে বসে আছেন। প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, " কাল যে জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেখলাম, একবার দেখা দিয়েই চলে গেলেন, তিনি কে ?" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "তিনি রাধারাণী ; এ মূর্তি চিন্ময়ী, তোমার খুব সৌভাগ্য যে একবার দেখতে পেলে।" আমি – " আপনিই তো দেখাচ্ছেন, একটু ভাল করে দেখতে পেলাম না, চকিত মাত্র দর্শন হল।" তিনি বললেন, "সবসময় নাম কর, আবার দেখতে পাবে।"
লীলা দর্শন হল। রাধাকৃষ্ণ দুটিতে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছেন। বাঁশীটি দুজনেই ধরে আছেন, অপূর্ব দৃশ্য। সেইখানে ফুল ছিল, সকলের চরণে দিলাম। সখীরা আরতি ছন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। তন্ময় হয়ে গিয়েছি। তখন দেখি, শ্রীশ্রীগোঁসাইজী কাছটিতে দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "দেবর্ষি নারদ যে বললেন রজে পা দিই না, আমরা যে দিচ্ছি ?" তিনি বললেন, " মা, মানুষদের সে ক্ষমতা নেই, স্থূল শরীরে তা হয় না। তোমরা যেমন গঙ্গায় স্নান কর, প্রথমে জল মাথায় দিয়ে তারপর অবগাহন কর, তেমনি রজে পা দেবার সময় মানসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পা দেবে। মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ সাষ্টাঙ্গ দিলে অনেক কিছু অনুভূতি হয়। এসব গুহ্য কথা সবাই বুঝতে পারে না, জিজ্ঞাসাও করে না। লিখে রাখ উপকার হবে।" তারপর বললেন, "দেবর্ষি নারদ এলে পায়ের দিকে লক্ষ্য করে দেখো পা রজে ঠেকে থাকে না।" আমি বললাম, " প্রথম যখন এখানে এলেন, বলে দেননি কেন ?" হাসতে লাগলেন।

১লা কার্তিক

সকালে - আসনে বসলাম। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে রয়েছেন। একটি ছোট ছেলে ও একটি ছোট মেয়ে সাত আট বছরের হবে, আমার কাছে এল। আমি বললাম, "কে তোমরা ?" মেয়েটি বলল, "তুমি বড় ভুলে যাও, এই তো সেদিন এসেছিলাম, আমি রাধা।" ছেলেটি বলল, "আমি কৃষ্ণ।" আমি-"তোমরা কি এই বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ না তোমাদের নাম রাধাকৃষ্ণ?" এই কথা যেই বলেছি অমনি দুজনের কি হাসি। হেসে কুটি কুটি। প্রাণ ঠান্ডা হয়ে গেল। তখন মেয়েটি মধুর সুরে বলল, "আমরা এই বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ। তুমি যে আমাদের নিজ জন। আমরা তোমাকে খুব ভালবাসি। তোমার মাথা ধরেছে কিনা তাই এলাম। একটু হাত বুলিয়ে দিই ভাল হয়ে যাবে।" আমি-"ছেলেমানুষ দুটিতে সেবা করতে এসেছ?" তখন আবার বলল, "আমরা না করলে কে করবে, আমরা ছাড়া তোমার যে কেউ নেই।" আমি-"তবে দাও।" কি মধুর স্পর্শ, মাথা ঠান্ডা হয়ে গেল। তারপর আর তাদের দেখতে পেলাম না। শ্রীশ্রীগোঁসাইজীকে বললাম, "সেবার যখন শ্রীবৃন্দাবনে এসেছিলাম, দর্শন করে মনে হয়েছিল এই খুব হল। কিন্তু এবার আপনি যে সুধাসিন্ধুতে ডুবিয়ে লীলাদর্শন করাচ্ছেন, মানুষে যে এ জিনিস ধারণা করতেও পারেনা। এবার এক নতুন জীবন লাভ করলাম। আপনার কৃপাই আমার সম্বল।" তখন তিনি বললেন, "তুমি প্রথমবার যেমন দেখেছিলে সবাই কি তাও দেখে ? এসব দেখার সৌভাগ্য সবার হয়না। ধাম দর্শনের ফল হবে সেই

কামনা করে লোকে দেখে, তাই দেখেই চলে যায়। এ জিনিস কোথায় পাবে ? সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করে সমস্ত তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে একেবারে নি:স্ব হয়ে নাম করতে হবে। কোন বন্ধন, আসক্তি থাকবে না। তা কি কেউ পারে মা ? সংসারকেই লোক নিজের ভাবে, ছাড়তে পারে না।"

২রা কার্তিক

সকালে – আসনে বসে নাম করছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করলাম। সেই ছোট ছেলে-মেয়ে দুটি এসে আমার দুই কোলে বসল। আমি – "তোমরা যে এখন এলে ?" মেয়েটি – "ঐ নামই আমরা। তুমি নাম কর আর আমাদের ছুটে আসতে ইচ্ছা করে। গোঁসাইজীও তোমাকে খুব ভালবাসেন।" তারপর চলে গেল। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে বললাম, "এইমাত্র রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ এসে আমার কোলে বসেছিল।" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী হাসতে লাগলেন। তখন আমি বললাম, "আপনি ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীই তো রাধাকৃষ্ণরূপে এসেছিলেন। আমাকে যেন আর ভুলিয়ে দেবেন না।" তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বললেন, "তোমার কাছে কিছুই গোপন থাকবে না। তুমি সবই দেখতে পাবে বা জানতে পারবে। খুব নাম কর সব প্রকাশ হয়ে যাবে।"

আমি প্রণাম করে বললাম, "আশীর্বাদ করুন যেন নামে ডুবে যাই।" দুজনেই আশীর্বাদ করলেন। তারপর দেখি যমুনার ধারে সখীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জল নিতে এসেছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শ্যামকে দেখলে ?" আমি বললাম – "না"। তখন সখীরা সবাই খুঁজতে লাগলেন। কুঞ্জবনের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। সখীরা দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে এলেন ও সবাই যমুনায় নেমে খেলা করতে লাগলেন। আমি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কাছটিতে বসে দেখছি যমুনার জলের কি শোভা। জীবন মধুময় হয়ে যাচ্ছে।

বিকালে – আসনে বসেছি। খুব জোরে নাম হতে লাগল। কিছুতেই স্থির হতে পারিনা। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে আর পারলাম না তখন ডুবে গেলাম। দেখি শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতে নৌকা নিয়ে বসে আছেন। রাধারাণী ও সখীরা এলেন। তাঁদের সবাইকে নৌকাতে তুলে নিলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে আমাকেও তুলে নিলেন। সমস্ত যমুনার জল এধার ওধার করে নৌকা আবার ঘাটে এসে দাঁড়াল। এই হতেই অনেকক্ষণ হয়ে গেল।

৩রা কার্তিক

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করলাম। দেখি- যমুনার তীর। সেই ছেলে-মেয়ে দুটি এসে কোলে বসলো। আমি বললাম, "আমি এখান থেকে চলে যাব তখন তো তোমাদের দেখতে পাবো না। তোমরা কত ভালোবাসো।" তখন তারা দুটিতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "তোমাকে কি আমরা ছাড়তে পারি, নাম করলেই যেখানে থাকো আমরা যাব। আসনে বসে নাম করলেই গোঁসাইজীর সঙ্গে আমরা যাব, দেখতে পাবে।" শুনে প্রাণটা আনন্দে ভরে গেল। তাদের আদর করলাম। বললাম, "আমার তো কিছু নেই তোমাদের খেতে দেব। গোপালই নন্দগ্রামে গিয়ে মা যশোদার কাছে ননী খেয়ে আসে।" তখন মেয়েটি বলল, "তুমি যখন দেশে যাবে, পুরী যাবে, তখন আমাদের খুব খাওয়াবে। এখন যাই আবার

আসব” বলে তারা চলে গেল। তখন দাদা মহাশয় এসে বলছেন, “দিদি বড় খুশি হলাম। ধন্য সদ্‌গুরুর লীলা। খুব নাম কর।“ আমি বললাম, “আপনাকে সেই একদিন দেখেছিলাম আর আজ দেখলাম। দিন কেন আসেন না ?” তখন বললেন, “দিদি এখানে সব নিয়ম বাঁধা আছে, যার যতটুকু অধিকার তার বেশি হবার জো নেই। আমি যেখানে থেকে ভজন করি, শ্রীশ্রীগোঁসাইজী যখন কৃপা করে আনেন তখন আসতে পাই। তোমার উপর শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর খুব কৃপা। নিত্যলীলা দর্শন করাচ্ছেন।“ আমি প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। বেশ প্রফুল্ল সৌম্যমূর্তি দেখলাম।

বিকেলে - আসনে বসে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে বললাম, “কাল যে ....শুনলাম ব্রজগ্রামের সব বৃক্ষদের প্রেমময় ভাবের কথা, আমি তো দেখতে পেলাম না। তখন শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, “সে সব সেই ভাবের সময় ছাপ পড়ে গিয়েছে, যেমন ফটো তোলে। যখন ব্রজলীলা করেছিলেন সমস্ত বৃন্দাবন প্রেমে মাখামাখি হয়ে ওই ভাব ধারণ করেছিলেন (সমস্ত বৃক্ষ, লতা, স্থাবর, জঙ্গম সব)। সেসব দর্শনে আনন্দ দেয় বটে তবে স্থায়ী নয়। তুমি যে নিত্যলীলা দর্শন করছ এ প্রত্যক্ষ, প্রতিদিন হচ্ছে, প্রাণে গেঁথে যাবে, কখনও সরবে না। তারপর এই রস আস্বাদন করবার অধিকার হবে। এইভাবে চলতে চলতে দেখবে কোথায় এসেছ ! মহাপ্রভু দুই রসজ্ঞ ভক্তের সঙ্গে এই রস আস্বাদন করতেন।“ আমি -“আপনারই কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনে এসে নতুন জীবন লাভ করলাম। এই যে ছোট রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ আসেন তাদের উপর বাৎসল্য ভাব হয় কেন?” শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - “মা, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর এই তিনটি ব্রজভাব। তোমার গোপালের ভাব নিয়ে ওঁরা আসেন। মধুরে যখন উঠবে তখন জীবন ধন্য হবে ও নিত্যলীলায় মিশে যাবে। তারপর মহাপ্রভুর ভাবে বিভোর হয়ে রস আস্বাদন করবে।“ আমি - “রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ যে বলেন, তুমি নাম করতে আসনে বসলেই আমরা তোমার কাছে ছুটে আসি, নাম তো আসনে বসে সবাই করেন, সেখানে যান না ?” তখন বললেন, “কতকগুলি সাধকের লক্ষণ আছে, গীতায় যেখানে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন, “যে ভক্ত আমার প্রিয় তার এই সব গুণ থাকা চাই” সে তো পড়েছ। কাজেই সকলে কি করে লীলা দর্শন পাবে। যার যখন সেই অবস্থা আসবে তখন দর্শন হবে। নাম করতে করতে সব ঠিক হয়ে যায়, যদি ঠিকমতো নাম করে। তা কি কেউ পারে মা ? বসে নাম করাই তাদের কষ্ট।“

৪ঠা কার্তিক

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। প্রণাম করলাম। এমন সময় ভক্তরাজ মহাবীর এলেন। তিনি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। বললাম, “আপনিও কি রজে পা দেন না ?” তিনি বললেন, “তুমি কি করে জানলে ?” তখন বললাম, “সেদিন দেবর্ষি নারদ এসেছিলেন তিনি বললেন। তাই আমার মনে হচ্ছে আপনিও তো মহাভক্ত, সেইজন্য জিজ্ঞাসা করছি।“ তিনি বললেন, “তোমার অনুমান সত্য। গোঁসাইজী তোমাকে কৃপা করেছেন সবই তোমার কাছে প্রকাশ হবে।“ আমি তখন বললাম, “ভক্তরাজ, আপনার বুকে যে “সীতারাম” লেখা আছে একবার দয়া করে দেখাবেন ? আমার বড় দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।“ তখন মহাবীর উঠে দাঁড়ালেন। সেই বিশাল বক্ষে “সীতারাম” নাম উজ্জ্বল বড় বড় অক্ষরে লেখা। সেই লেখার ভিতর সীতারামের মূর্তি রয়েছে। কি অপূর্ব দর্শন। মহাবীরকে আর দেখতে পেলাম না। (রাম

অক্ষর দুটির মধ্যে রামের ও সীতা অক্ষর দুটির মধ্যে সীতার মূর্তি)। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সেখানে বসেছিলেন। সীতারামের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেন। আমি মুগ্ধ নয়নে দেখতে দেখতে ডুবে গেলাম। ধন্য ভক্তরাজ ! আজ শ্রীশ্রীগোঁসাইজী কৃপা করে কি অপূর্ব দৃশ্য দেখালেন, বর্ণনা করার আমার শক্তি কোথায় ! আমি তখন তাঁদের প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই ছোট রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ এসে কোলে বসলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এতো দেরি করে এলে ?" রাধা বলল, "চোর চোর খেলা করছিলাম যে। কৃষ্ণ এমন লুকিয়েছিল, কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর দেখতে পেয়ে তোমার কাছে ছুটে চলে এসেছি। সখীরা এখনও খুঁজছে।" দুজনে আমার দুই কোলে বসলো। তখন আমার গোপাল মিটমিট করে চেয়ে দেখছে। আমি তাকে বললাম, "তুমি মাঝে বস।" গোপাল বসলো। তারপর সব মিলিয়ে গেল।

৫ই কার্তিক

সকালে – আসনে বসেছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে দেখলাম কালিন্দীর তীর। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। রাধারাণী ও সখীরা সব জলে সাঁতার কাটছেন। শ্রীকৃষ্ণ এসে তিনিও জলে নেমে পড়ে সাঁতার কাটতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে সবাই উঠে এলেন। কাপড় পড়ে রাধারাণীর মনে কি উদয় হল, মান করে বসলেন। শ্রীকৃষ্ণ অনেক সাধাসাধি করলেন। চরণ ধরেও অনেক সাধাসাধি করলেন কিছুতেই মান ভাঙলো না। তখন শ্রীশ্রীগোঁসাইজী শ্রীকৃষ্ণকে কি বলে দিলেন। কৃষ্ণ তখন কুঞ্জবনে লুকিয়ে বসলেন। যেই কৃষ্ণ সরে গেলেন, অমনি মানিনীর মান চলে গেল। সখীদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কৃষ্ণ কোথায় গেল ?" সখীরা বলল, "আমরা কি জানি, কথায় কথায় মান, কত সাধলো শেষে চলে গেল।" রাধারাণী বললেন, "আর মান করব না, তোরা ডেকে আন।" তখন সখীরা যেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এলেন। দুজনে যুগলে দাঁড়ালেন। সখীরা নৃত্য করতে লাগলো । অপূর্ব দৃশ্য ! শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "সব সত্য, লিখে রেখো। প্রাণ ভরে দেখ।" দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৬ই কার্তিক

সকালে – আসনে বসে নাম করছি। দেখি শ্রীগুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন, প্রণাম করলাম। বললেন, "মা, কিছু খাওয়াতে পার ?" আমি – " কি খাবেন ? এখানে কোথায় কি পাব ?" বললেন, "যা আছে তাই করে দাও।" ঘরে দুটি আটা ছিল, লুচি করে মিষ্টি দিয়ে ভোগ দিলাম।
[সেদিন কোন কারণবশতঃ উপবাসী ছিলাম।]

৭ই কার্তিক

সকালে – আসনে বসে নাম করছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। প্রণাম করে কাছে বসলাম। যমুনার তীর। কেলিকদম্ব বৃক্ষের তলে দেখলাম চারজন জ্যোতির্ময় মূর্তি মুনি এসে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী আমাকে তাঁদের প্রণাম করতে বললেন। আমি প্রণাম করলাম। তাঁরা "মঙ্গল হোক" বলে আশীর্বাদ করলেন। আমি তাঁদের চিনতে

পারছিলাম না। তাঁরা আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, "আমাদের নাম সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার। গোঁসাইজীকে দর্শন করতে এসেছি। মা, পরম সৌভাগ্য, সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছ, তাঁর কৃপালাভ করেছ। শ্রীবৃন্দাবনলীলা দর্শন করে গোঁসাইজীর চরণে মগ্ন হয়ে যাবে। সব পূর্ণ হবে। দেখবে কি অপূর্ব রাজ্য। গোঁসাইজীর কৃপা ছাড়া এ জিনিস কেউ পায় না। সব সময় নামে মগ্ন থাক। এই অবস্থায় সদ্‌গুরুর সঙ্গ করা হয়। নাম ছেড়ো না।" আমি তাঁদের দেখে, কথা শুনে খুব আনন্দ করছি। তারপর তাঁরা আবার শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে চলে গেলেন। আমি শ্রীশ্রীগোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি আনন্দময় জ্যোতিঃপূর্ণ চেহারা।" তিনি বললেন, "হরিনামে নামের সঙ্গে ওঁরা এক হয়ে গিয়েছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ওঁরা কেউ রজে পা দেননি ?" তিনি হাসতে লাগলেন। তারপর দেখলাম সখীরা, রাধাকৃষ্ণ সব এলেন। আজ কুসুম কাননে ফুল তুলে রাধারাণীর বেণী রচনা হবে। সখীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ফুল তুলতে গেলেন। রাধারাণী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কোলের কাছে বসে রইলেন। সখীরা ও শ্রীকৃষ্ণ ফুল নিয়ে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর চুলের মধ্যে ফুল দিয়ে দিয়ে বেণী রচনা করলেন। কি সুন্দর হল। রাধা যেন ফুলময়ী হয়ে গেলেন। তখন সখীরা রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের বামে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সবাই মিলে নৃত্যগীত করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে মিশে গেলেন। অপূর্ব দৃশ্য হল। ধন্য হয়ে গেলাম। তন্ময় হয়ে দেখছি। যখন ঠিক (প্রকৃতস্থ) হলাম দেখি তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। আমার দুই কোলে সেই ছোট রাধাকৃষ্ণ দুটি এসে বসল। আমি- "এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?" রাধা –"খেলা করছিলাম তাই আসতে দেরী হল। আমরা না এলে তোমার কষ্ট হয়, নয় ? আমরা তোমাকে খুব ভালবাসি। ঐ নামই তো আমরা।" আমি – "সবাই তো নাম করছে সেখানে যাও না কেন ?" তখন কৃষ্ণ বলল, "তারা নাম করে , কিন্তু আমাদের চায় না। অনেক বাসনা-কামনা থাকে সেইজন্য আমরা যাই না। যে সব কিছু ছেড়ে শুধু আমাকে চাইবে আমি তার কাছে যাই। এই রাধা আর আমি এক।"

৮ই কার্তিক

সকালে – ভোরে উঠে দেখি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও শ্রীগুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন। খুব ভাল দর্শন হল। তারপর আসনে বসে দেখি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। নিকুঞ্জ বনে শ্রীমতী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন। সখীরা ফুল তুলে নিয়ে এলেন। আমাকে বললেন, "মালা গাঁথ।" আমি খুব খুসী হয়ে মালা গাঁথতে লাগলাম। সখীরাও মালা গাঁথতে লেগেছেন। অনেক মালা গাঁথা হল। তারপর শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও রাধাকৃষ্ণকে সেইসব মালা পরান হল। এমন সময় দেবর্ষি নারদ এলেন ও তাঁদেরকে প্রণাম করলেন। তখন সখীরা দেবর্ষিকে বললেন, "আপনি বীণাযন্ত্রে গান করুন আমরা নৃত্য করি।" শ্রীনারদ মহা আনন্দে বীণাযোগে রাধাকৃষ্ণ লীলা গান করতে লাগলেন। সখীরা নৃত্য করতে লাগলেন। কি অপূর্ব মনোরম দৃশ্য ! প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। দেখতে দেখতে কোথায় ডুবে গেলাম। যখন বাহ্য জ্ঞান হল দেখি আসনে বসে আছি। কি দেখছি কিছুই বুঝতে পারছি না। গুরুকৃপায় জীবন ধন্য হয়ে যাচ্ছে। সেই ছোট রাধাকৃষ্ণ দুটি এসে আমার দুই কোলে বসল। আমি – "খেলা করছিলে ?" রাধা – "মা যশোদার কাছে ননী খেয়ে খেলতে গিয়েছিলাম। তোমার গোপালও খাচ্ছে দেখলাম।" আমি – "এখান থেকে শীঘ্র চলে

যেতে হবে।“ তখন দুজনেই বলল, “দুঃখ করো না, তুমি যেখানেই যাবে সেইখানে গোঁসাইজী তোমাকে বৃন্দাবনলীলা দর্শন করাবেন। আমাদেরও দেখতে পাবে। আনন্দ কর, কোন চিন্তা নেই।

বিকালে – আসনে বসে নাম করছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। সখীদের সঙ্গে রাধারাণী এলেন। কি জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ! আমি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখছি। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ এসে রাধাকে বললেন, “আজ যমুনায় যাবে না ?” রাধারাণী বললেন, “না, আজ এখানে পাশা খেলা হবে।“ শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “বেশ কথা, তুমি হারলে কি দেবে?” রাধারাণী বললেন, “আমার এই গলার মালা তোমাকে পরিয়ে দেব, আর তুমি হারলে কি দেবে?” শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “আমার সবই তো তোমাকে দিয়েছি, এই বাঁশীটা আছে একবার বাজাতে দেব।“ রাধারাণী বললেন, “ইস, একেবারে নিয়ে লুকিয়ে রাখবো।“ তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “গোঁসাইজী সাক্ষী থাকলেন, কার হার-জিত হয় বলে দেবেন।“ তারপর কি হল দেখতে পেলাম না, দেখি আসনে বসে আছি।

৯ই কার্তিক

আজও সকালে বিছানা থেকে ওঠবার আগে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও শ্রীগুরুদেব কে সামনে দেখে প্রণাম করে উঠলাম। তারপর আসনে বসলাম। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। যমুনার ধারে তমালতলাতে একটি বেদী বাঁধা হয়েছে। সখীরা বললেন, “রাধারাণী ঐখানে আজ সূর্য পূজা করবেন।“ পূজার জন্য সখীরা ধূপ, দীপ প্রভৃতি পূজার উপকরণ সব এনে রাখলেন। কি সুন্দর করে বেদীতে আলপনা দেওয়া হল। রাধারাণীর অপূর্ব বেশ। পা দুখানিই চোখে ভাসছে। তিনি সূর্য পূজা করলেন। অনেক ফুল ছিল সেখানে, আমি নিয়ে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, রাধারাণী ও সখীদের চরণে দিলাম। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাতে বাজাতে সেখানে এলেন। তখন সখীরা রাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের বামে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নৃত্যছন্দে আরতি করতে লাগলেন। তারপর শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, রাধাকৃষ্ণ সব একসঙ্গে মিশে গেলেন। সেই রাধাকৃষ্ণ দুটিতে এসে বসলো। আমি– “কোথায় খেলছিলে ?” রাধা- “এই কাছেই বংশীবটে। খেলতে খেলতে তোমাকে দেখতে ছুটে এসেছি, আবার যাই,” বলে দুজনেই ছুটে চলে গেল।

১০ই কার্তিক

সকালে - আসনে বসে নাম করছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, শ্রীগুরুদেব সবাইকে প্রণাম করলাম। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, “মা, তোমাকে পুরী যেতে হবে।“ ....কথা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, “ওর এখন পুরী যাওয়াই মঙ্গল।“ সেই ছোট রাধাকৃষ্ণ এসে বললে, “পুরী গিয়ে খুব ভোগ দিও। আমরা তোমার সঙ্গে খাব।“ তারপর দাদাগোঁসাই** এলেন। আমি সবাইকে প্রণাম করলাম। দাদাগোঁসাই বললেন, “মা তোমার জীবন মধুময় হয়ে যাবে, অল্প দিন বাকি আছে। এখানে যে উদ্দেশ্যে ঠাকুর এনেছিলেন সিদ্ধ হয়েছে। কিছুদিন পর পুরী গিয়ে পূর্ণানন্দে ডুবে যাবে। দুর্লভ অবস্থা লাভ হবে। তোমাকে দেখে বড় আনন্দ পেলাম। খুব নাম কর মা, সর্বদা নামে ডুবে থাকো। নামে ডুবতে পারলে তবে নামীর স্বাদ পাওয়া যায়। তখন সর্ব অঙ্গে নামের অনুভূতি হবে। প্রেমানন্দে মগ্ন থাকবে।“ আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। আমারও সে অবস্থা চলে গেল।

[**শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর পুত্র শ্রীযোগজীবন গোস্বামী মহাশয়]

১১ই কার্তিক

সকালে আসনে বসে দেখছি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। ঘাগরা পড়া, ওড়না গায়ে ব্রজগ্রামের ব্রজমায়ীরা সব বসে আছেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর সঙ্গে কি সব কথা বলছেন। আমি বুঝতে পারলাম না। প্রথম দিন বৃন্দাবনে এসে যাঁদের দেখেছিলাম তাঁরাই সব এসেছেন মনে হল। রাধারাণী ও সখীরা এলেন। শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় বাঁশী বাজাচ্ছেন। সখীরা রাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের বামদিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। দুজনে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাতে লাগলেন।

বিকালে – লালাজীর কুঞ্জে গেলাম। রাধারাণী, কৃষ্ণচন্দ্র ও ললিতা সখীকে দেখলাম। খুব নাম হতে লাগল। বসে পড়লাম। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণী এসে আমার দুই কোলে বসল। কি যে আনন্দ কি লিখবো! কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতস্থ হলাম।

১২ই কার্তিক

সকালে – আসনে বসে নাম করছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী দাঁড়িয়ে আছেন, শ্রীগুরুদেবও পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সকলকে প্রণাম করলাম। তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। শ্রীগুরুদেব- "মা, ব্রজধামের লীলা দর্শন হল। আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। কিছুদিন পর পুরী যেতে হবে। সেখানে গিয়ে লীলারস আস্বাদন হবে। মহাপ্রভু সেদিন এই কথা বলে গেলেন। লক্ষ্যস্থির রাখবে। নামে মগ্ন থাক। কোন দিকে লক্ষ্য কোরো না।" আমি বললাম - "আমি কিছু জানিনা, আপনি যা করাবেন তাই হবে।"

১৩ই কার্তিক

সকালে – আসনে বসেছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আছেন, প্রণাম করলাম। বললাম, "আজ সবাই পরিক্রমা করতে গেলেন, আমার পায়ে তো ব্যথা, যেতে পারলাম না।" তখন শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "তোমার তো ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা হয়ে গিয়েছে।" আমি – "কখন হল আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না।" তখন বললেন – "যখন উদ্ধব তোমাকে নিয়ে যেতেন, তখন আগে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করে তবে উর্দ্ধে উঠতেন। এখানের যা করবার, সব করা হয়েছে।" আমি – "(এখানে এই যে সব) যুগলে দর্শন বা পরিক্রমা করতে হয় এর মানে কি ?" বললেন – "শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, তাঁকে হৃদয়ে স্থাপন করতে হয়। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন করে সব কাজ করতে হয়, তা হলেই যুগলে দর্শন ও পরিক্রমা হয়। লোকে তা বোঝেনা, ভুল করে।" আমি – "আমি তো আপনার (সদ্গুরুর) আসন হৃদয়ে স্থাপন করেছি, শ্রীগুরুদেব ও আপনি তো এক।" তখন বললেন, "ঠিক বলেছ মা, গুরুগোবিন্দে কোন প্রভেদ নাই। শ্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রভুর যেসব দর্শন হয়েছিল, পুরীতে গিয়ে সেই সব লীলারস আস্বাদন করার কথা মহাপ্রভু বলে গেলেন।" তারপর সেই ছোট কৃষ্ণটি এলেন। আমি – "আজ রাধা কোথায় ? একলা এসেছ ?" বলতে বলতে রাধা এসে বলছে, "এই যে আমি এসেছি, (কৃষ্ণকে দেখিয়ে) আজ আমাকে ফেলে চলে এসেছে। আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে।" আমি – "কিসের জন্য ঝগড়া হল ?" রাধা – "ঐ বাঁশী নিয়ে আর কি।" আমি –"বাঁশী কি হলো ?" রাধা আমার পানে মিট্‌কে হেসে চোখ টিপে বলল, "কি জানি কোথায় ফেলেছে, এখন আমাকে বলছে তুমি নিয়েছ, আমি নিয়ে কি করবো বল

তো ।“ শ্রীকৃষ্ণ তখন বলল, “তবে গেল কোথায় ? আমার হাতেই তো ছিল, রাধাকে দেখলেই আমার সব ভুল হয়ে যায়, সেই সময় নিয়েছে।“ তখন শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাদের ঝগড়া শুনে খুব হেসে উঠলেন। রাধারাণীকে বললেন, “আর কেন এইবার দিয়ে দাও।“ তখন রাধারাণী হাসতে হাসতে কাপড়ের ভিতর থেকে বাঁশীটি বের করে কৃষ্ণের হাতে দিতেই যুগলে দাঁড়িয়ে বাঁশীটি বাজাতে লাগলেন। তারপর দেখি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, শ্রীগুরুদেব সবাই রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে মিশে মিলিয়ে গেলেন।

বিকালে – আসনে বসেছি। (আজ সকলে শ্রীরাধারাণীর চরণ দর্শন করতে যাচ্ছেন।) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। প্রণাম করলাম। তাঁরা আশীর্বাদ করলেন, বললেন, “আজ রাধারাণীর চরণ দর্শন করতে হয়। তোমার এখানেই দর্শন হবে।“ দেখি, একটি কুঞ্জের মধ্যে রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ একটি ফুলের সিংহাসনে বসে আছেন। রাধারাণীর চরণ দুখানি পদ্মফুল দিয়ে ঢাকা। তখন মনে করছি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী যে বলেছেন চরণ দর্শন করতে হয়, চরণ তো ফুলে ঢাকা। কাতর প্রাণে শ্রীমতী রাধারাণীর চরণ পানে চেয়ে আছি। তখন দেখি সেই রাশীকৃত পদ্মফুল (আপনা হতেই) চরণ থেকে সরে গেল, আর সেই দেবদূর্লভ শ্রীচরণ দেখতে পেলাম। কি অপূর্ব দৃশ্য ! সেই অপরূপ শ্রীচরণ দুখানি লাল টুক্‌টুকে আলতা পরান। চারদিকে ফুলকাটা মণিময় অলঙ্কার পায়ে পরান আছে। সেইসব রত্ন দিয়ে জ্যোতিঃ বের হচ্ছে। সে শোভার কি বর্ণনা করব ! একবার চরণ দুখানি ফুলে ঢাকা পড়ছে, আবার একবার ফুল সরে গিয়ে সেই মনোহর শ্রীচরণ দুখানি দর্শন হচ্ছে। বহুক্ষণ সেইভাবে দর্শন হতে লাগল, দর্শন করতে করতে ডুবে গেলাম।

১৪ই কার্তিক

সকালে – আসনে বসলাম । শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। প্রণাম করলাম। যমুনার তীর। সেই ছোট রাধাকৃষ্ণ দুটি এসে আমার দুই কোলে বসল। আমি – “আজ ঝগড়া হয়নি?” কৃষ্ণ - “আমি তো ঝগড়া করিনে, রাধাই কথায় কথায় রাগ করে।“, রাধা মিটি মিটি হাসছে, বলল, “গোপাল কোথায় ? গোষ্ঠে গিয়েছে বুঝি ?” শ্রীশ্রীগোঁসাইজী – “আজ কোথায় খেলা করছিলে?” রাধা - “নিধুবনে।“ তারপর সব অদৃশ্য হয়ে গেল।

১৫ই কার্তিক

সকালে – আসনে বসে নাম করছি । শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। শ্রীগুরুদেব আর শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, “......পুরী যাওয়ার প্রয়োজন। সেখানে গেলে ওর অবস্থার পরিবর্তন হবে। কর্ম শেষ হলেই আনন্দ পাবে।“ আমি – “আপনি ......কে বলুন।“
শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, “এখনও সে সময় আসেনি। একটু দেরী আছে। দৃঢ় বিশ্বাস চাই। তুমিই বলে দিও।“ শ্রীগুরুদেব, “......কে পুরী যেতে বল, আনন্দ পাবে। এখানে তোমাদের আর থাকার দরকার নেই।“ আমি প্রণাম করলাম। তাঁরা আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। সেই রাধাকৃষ্ণ দুটি এসে কোলে বসল। আমি - “কোথায় খেলছিলে ?” রাধা - “এখনও খেলতে যাইনি, নিকুঞ্জ বন থেকে আসছি। আজ যমুনার তীরে খেলা করব।“ তারপর সব অদৃশ্য হয়ে গেল।

১৬ই কার্তিক

সকালে – আসনে বসে নাম করছি । দেখি, শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যমুনার তীরে বসে আছেন। সেখানে গিয়ে প্রণাম করে কাছে বসলাম। শ্রীশ্রীগোঁসাইজীকে বললাম, "এখান থেকে তো চলে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে যেন সাধনে বাধা না হয়, আসনে বসলেই যেন আপনাদের দেখতে পাই। এখানে যেমন মনে হয় আপনাদের কাছেই আছি, বাইরে থাকলেও আপনাদের সঙ্গ ছাড়া হই না।" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী – "কোন চিন্তা করো না, আমরা সবসময় তোমার মধ্যে থাকবো।"
শ্রীশ্রীগোঁসাইজী যে ভাবে কৃপা করছেন আমি জানি না কি তপস্যার ফলে সদ্‌গুরু সাক্ষাৎভাবে দর্শন দিচ্ছেন। জীবন মধুময় করে দিয়েছেন। তাঁরা দুজনেই আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "ভয় নাই, যখনই নাম করবে দেখতে পাবে।" তাঁদের চরণে প্রণাম করে নিশ্চিন্ত হলাম। সেই রাধাকৃষ্ণ দুটি এসে কোলে বসল। রাধা – "কি কথা হচ্ছে ? চলে যাবে তো কি হয়েছে, আমরা সবাই তোমার কাছে থাকবো।" সখীরা সব জল নিতে এসেছে। আমি – "আমি রাসের পর চলে যাবো, তোমরা আমায় ভুলে থেকো না।" তখন সবাই বললেন, "গোঁসাইজী তো বলেছেন সেখানেও এই বৃন্দাবনলীলা দর্শন হবে। সদ্‌গুরুর কৃপা যে লাভ করে তার কিছু কি অপ্রাপ্য থাকে ? ইচ্ছামাত্র সব পূর্ণ হয়"- এই বলে তাঁরা সব চলে গেলেন। রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ এসে যুগলে দাঁড়ালো। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁদের সঙ্গে মিশে গেলেন, অপূর্ব দর্শন ! লিখে এর কি জানাব।

১৭ই কার্তিক

সকালে – আসনে বসে নাম করছি । শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। প্রণাম করে তাঁদের কাছে বসলাম। দেবর্ষি শ্রীনারদ এলেন। তিনি তাঁদের প্রণাম করে বসলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। বললাম, "চলে যাবো, আশীর্বাদ করুন যেন নামে ডুবে যাই, আর সদ্‌গুরু কৃপা করে যে অবস্থা দিয়েছেন, তাতেই যেন বিভোর হয়ে থাকি। শ্রীনারদ বললেন, "মা, তোমাকে গোঁসাইজী কৃপা করেছেন। যেখানে থাক সেইখানেই শ্রীবৃন্দাবনলীলা দর্শন হবে। তোমার হৃদয়ে গোঁসাইজীর আসন পড়েছে, তাঁর সব লীলা তোমার মধ্যে প্রকাশ পাবে। কিছুদিন পরে পুরী গিয়ে ব্রজলীলারস আস্বাদন হবে। তোমার উপর গোঁসাইজীর অসীম করুণা।" তারপর দেখি শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণী যুগলে দাঁড়ালেন। শ্রীগুরুদেব ও মাজননী এলেন। তাঁরাও দাঁড়ালেন। তখন সখীরা শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, গুরুদেব, মাজননী, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সকলকে ঘিরে চারিদিকে নৃত্য করতে লাগলেন। কি অপূর্ব দৃশ্য ! তন্ময় হয়ে দেখছি, তারপর সবাই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বললেন, "......কে নির্ভর করতে বল, চিন্তার কারণ নেই, সময়ে সব প্রকাশ পাবে।" তারপর সেই ছোট রাধাকৃষ্ণ এসে দুই কোলে বসল। আমি – "খেলতে যাবে না ?" রাধা – "এইবার যাব, তোমার কাছে না এলে খেলা ভাল লাগে না। তুমি আসনে বসলেই তোমার কোলে বসতে ইচ্ছা করে।" আমি – "কোথায় খেলা করবে ?" "যমুনা পুলিনে"- এই বলে তারা ছুটে চলে গেল।

১৮ই কার্তিক

সকালে – আসনে বসে নাম করছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম। সেই ছোট রাধাকৃষ্ণ এসে দুই কোলে বসল। (আমি কোন কাজের জন্য উঠছি) তারা বলল, "আজ তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ?" আমি – "চা করতে যাচ্ছি, তোমরা খাবে?" রাধা – "গোঁসাইজীর সঙ্গে তো প্রতিদিনই খাই।" তারপর সব মিলিয়ে গেল।

১৯শে কার্তিক

সকালে – শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন। প্রণাম করে কাছে বসলাম। শ্রীশ্রীগোঁসাইজীকে বললাম – "কাল বৃন্দাবন দর্শনে রাধাবাগ দেখে খুব ভালো লাগলো। কি সুন্দর রজ, দেখে খুব আনন্দ হচ্ছিল। সেই নিমগাছ দেখলাম, যেখান থেকে সেই বৈষ্ণব আপনার কাছে প্রকাশ হয়েছিলেন। দেবী কাত্যায়নীকে দেখেও খুব ভালো লাগলো। নামও খুব কৃপা করলেন। এই কাত্যায়নীকে পূজা করে ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করেছিলেন?" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "ইনিই যশোদা গর্ভসম্ভুতা যোগমায়া। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় যোগমায়ারূপে প্রকাশ হয়েছিলেন।" আমি - "বড় মহাপ্রভু দেখতে গিয়েছিলাম। দেখে ভালো লাগলো বটে কিন্তু ভিতর স্পর্শ করল না। এখন মহাপ্রভুকে যে বেশে দেখি সেই বেশই আমার ভালো লাগে। প্রেমের ঠাকুর - তাঁর সেই মুণ্ডিত মস্তক, কৌপীন বহির্বাস পরা, কমন্ডলু হাতে, চোখ দুটি ভাবে ডগমগ করছে, তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ, সহাস্য বদন, অপূর্ব মনোহর রূপ!" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "মা, যে ভক্তের যে ভাব সে তাইই দেখে। বড় মহাপ্রভু যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন সন্তান ভাব নিয়ে, তাই ওরকম বেশ করেছে, নিজে আনন্দ পাবে বলে। তুমি যা দেখছ এইই তাঁর প্রকৃত রূপ।" তখন বললাম, "আর একবার মহাপ্রভুকে দেখতে পাবোনা?" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - "খুব টান আর ইচ্ছে যখন হবে তখন দেখতে পাবে।"
আমি – "এখুনিই খুব টান ও ইচ্ছা হচ্ছে", বলতে বলতে দেখি প্রেমের ঠাকুর কৃপা করে এসে দাঁড়ালেন। আমি প্রণাম করে বললাম, "আজ আমার মাথায় আপনার চরন দিতে হবে।" তিনি হাসতে হাসতে সেই দেবদূর্লভ যোগীজনবাঞ্ছিত শ্রীচরণ আমার মাথায় দিলেন। চেয়ে দেখলাম শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর চরণ। সে ভাব কেটে গেলে শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে দাঁড়ানো দেখলাম।
আমি, "এবার পুরীতে জগন্নাথবল্লভে আপনার যে মূর্তি আছে, রায় রামানন্দ'র সঙ্গে কথা বলছেন, যেন প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, আপনার কাছে এই প্রার্থনা।" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পানে চেয়ে হাসলেন। শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু বললেন, "তাই পাবে মা।" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী – "সব লিখে রাখো। প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা। গুরুকৃপা ছাড়া কেউ এর মর্য্যাদা দিতে পারবে না। এই লেখার মধ্যে সমস্ত লীলার শক্তি মাখান রইল। এই শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে যার খুব ব্যাকুলতা আছে, আসতে পারছেনা, তার কাছে এই শ্রীবৃন্দাবন লীলা পাঠ করো। তোমার মুখে শুনলে এই আনন্দ তাকে স্পর্শ করবে। তোমার উপর শক্তি সঞ্চার করলাম।"

২০শে কার্তিক

সকালে – আসনে বসেছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও শ্রীগুরুদেব সেখানে বসে আছেন। তাঁদের প্রণাম করে কাছে বসলাম। আমি - "কাল সব দেবালয় দর্শনে গিয়েছিলাম ; ভাল লাগল, কিন্তু রাসলীলা দর্শন হল না।" শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন, "রাসলীলা দর্শন করতে ইচ্ছা হচ্ছে?" বললাম, "একদিন দেখিয়েছিলেন, কি মধুর মনোরম দৃশ্য।" শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর সঙ্গে কথা বলছি, দেখি যমুনাপুলিনে সব গোপীরা, অষ্টসখীর সঙ্গে শ্রীমতী রাধারাণী রয়েছেন। যত গোপী তত কৃষ্ণ, মধ্যে রাধাকৃষ্ণ যুগলে দাঁড়িয়ে আছেন। চারিদিকে মন্ডলী হয়ে সব সখীরা কৃষ্ণ কন্ঠ আলিঙ্গন করে নৃত্য করছেন। কি দেখছি ! অপূর্ব ! যার তুলনা নেই ! ধন্য ঠাকুর, তোমার কৃপায় আমার আর কোন সাধ অপূর্ণ রইল না। দেখতে দেখতে সব অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও শ্রীগুরুদেব এঁদের কাছে বসে আছি। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - "কেমন দর্শন হল ?" আমি কি বলব ! ভিতরে আনন্দের ঢেউ খেলছে, মুখে কথা সরলো না। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী আমার অবস্থা বুঝতে পেরে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "স্থির হও মা, বহুভাগ্যে হৃদয়মন্দিরে রাসলীলা দর্শন হয়। আজ তোমার শ্রীবৃন্দাবন বাসের শেষ দিন, সেইজন্য রাসলীলা দর্শন পেলে ; শ্রীবৃন্দাবনে যা রাধাকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ লীলা। এরপর আর লীলা নেই। সবসময় নামে মগ্ন থাক। নামরসে ডুবে যাও। পুরী গিয়ে এইসব লীলারস আস্বাদন হবে।" তারপর সেই ছোট রাধাকৃষ্ণ দুটিতে এসে আমার দুই কোলে বসল। আমি- "কাল রাত্রে যমুনা পুলিনে রাসলীলা হল, তোমরা ছিলে তো ?" রাধা - "তুমিও তো এখন দেখলে।" আমি - "তুমি কি করে জানলে ?" রাধা হাসছে, বলল- "আমি যে তোমাকে গোঁসাইজীর সঙ্গে দেখলাম।" তারপর সব অদৃশ্য হয়ে গেল।

২১শে কার্তিক

সকালে - দেশে ফিরবার জন্য বৃন্দাবন ষ্টেশনে ট্রেনে চাপলাম। ট্রেন ছাড়বার পরই বসে আছি, তন্দ্রার মত হয়ে দেখলাম, শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ঘিরে সখীরা মণ্ডলী হয়ে নৃত্য করছেন। অপরূপ সব জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। সমস্ত বৃন্দাবনলীলা হৃদয় মাঝে প্রকাশ হয়ে উঠলো। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, রাধাকৃষ্ণ, সখীদের সব দর্শন করতে করতে আনন্দে মগ্ন হয়ে গেলাম। যখন মথুরা ষ্টেশনে এসে ট্রেন থামল, তখন সেই অবস্থা চলে গেল। প্রাণে খুব আনন্দ হচ্ছে। ঠাকুরের কৃপায় জীবন ধন্য হয়ে দেশে ফিরে এলাম।

সন্ ১৩৫৬ সালে, আমি তখন শ্রীবৃন্দাবনে, একদিন সকালে - সেদিন বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতিথি, আসনে বসে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় হঠাৎ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এলেন। প্রণাম করলাম, আশীর্বাদ করে আমাকে বললেন – "মা, আমাকে একটু চা খাওয়াতে পারো ?" আমি তখন শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর মুখপানে তাকালাম, তিনি বললেন, "একটু চা করে পাশের ঘরে (সেই ঘরে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের একজন শিষ্য ছিলেন) তোমার গোপালের রুপার বাটি করে দিয়ে এসো।" আমি তাঁর আদেশমত চা তৈরি করে তাঁর কাছে দিয়ে এলাম।

সন ১৩৭১, ১২ই অগ্রহায়ণ

সকালে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে তাঁদের কাছে বসলাম, তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। তারপর তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ের অনেক কথাবার্তা হচ্ছিল। হঠাৎ সেখানে শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এলেন। আমি প্রণাম করলাম, আশীর্বাদ করে বললেন – "মা, 'শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলা' যখন দর্শন করেছ সেসব কাহিনী বইতে বের হয়েছে। আমার ইচ্ছে এই 'শ্রীবৃন্দাবনলীলা'তে আমার নাম থাকে। আমি তোমার কাছে চা চেয়ে খেয়েছিলাম, সেকথা তুমি লেখ নাই।" আমি বললাম – "বাবা, আমি আপনার শিষ্য-শিষ্যাদের ভয়ে লিখিনি যদি তাঁরা সমর্থন না করেন। তখন ব্রহ্মচারী মহাশয় বললেন, "মা, ...কে আমার আশীর্বাদ দিয়ে বলবে সে তখন শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত ছিল। আমি সে কথা প্রকাশ করতে বলছি।"

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন - "ইংরাজি শ্রীবৃন্দাবনলীলা ছাপা হচ্ছে, তাতে প্রকাশ করে দাও।"

১লা বৈশাখ ১৩৭২

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম, তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলতে বলতে প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু এলেন। তাঁকে প্রণাম করলাম, আশীর্বাদ করে বললেন – "মা, আজ বৎসরের প্রথম দিন, বিশ্ববাসী সকলকেই আশীর্বাদ জানাচ্ছি।" অন্যান্য কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় দেখি শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে বসলেন। আমিও তাঁকে প্রণাম করলাম, আশীর্বাদ করে বললেন – "মা, শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলাতে (ইংরেজি সংস্করণ) আমার কথা থাকায় অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি। মা, গোঁসাইজীর অসীম করুণা তোমার উপর, তোমার দ্বারা যেসব উপদেশ লীলা প্রচার করলেন, সময়ে এইসব বাণী রক্ষাকবচের মত নর-নারীর অবলম্বন হবে। ঘরে ঘরে বিজয় শঙ্খধ্বনি কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। আশ্রমে, মঠে দলাদলি ভাব ঢুকে সত্যকে ফুটতে দিচ্ছে না, নিজ নিজ মনমত ভাব প্রকাশ করছে। মা, এখন এই সত্যগৃহে এসে দেখছি মহাপ্রভুর ধর্ম যা গোঁসাইজী আচন্ডালে বিলিয়ে গেলেন তাও কয়েকটি লোক নিতে পেরেছে। আবার যেসব উপদেশ দিলেন তাও দলাদলির নিয়ে নিতে পারছে না, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় যেখানে দলাদলির ভাব নেই, তারা সাদরে গ্রহণ করছে ও করবে।"